আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ চতুর্বিংশ সংখ্যা
১৬-৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ ১-১৫ পৌষ ১৪২৬

মূল্য : ২০ টাকা

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত

স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক

শুভনীল চৌধুরী

subhanilc@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তর

আরেক রকম

৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২

প্রতি সংখ্যা ২০ টাকা

বার্ষিক সডাক ৫০০ টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে ‘সমাজ চর্চা ট্রাস্ট’-এর সদস্য হলে তাঁকে *আরেক রকম*-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com

samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)

৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন

কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা

রবিন মজুমদার

৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ চতুর্বিংশ সংখ্যা ১৬-৩১ ডিসেম্বর ২০১৯,
১-১৫ পৌষ ১৪২৬
Vol. 7, Issue 24th, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য
অমিতাভ রায়

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছবি: নন্দলাল বসু

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা কুড়ি টাকা

বার্ষিক সডাক পাঁচশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সম্পাদকীয়
হিন্দুরাষ্ট্র বনাম ধর্মনিরপেক্ষ ভারত ৫
অন্যায়, অন্যায় এবং অন্যায় ৭

সমসাময়িক
ক্রয়ক্ষমতার ক্ষয় ১০
মালিকের হাত শক্ত করো! ১২
ইম্পিচমেন্টের মুখে ট্রাম্প ১৩

বাবরি মসজিদ রায় প্রসঙ্গে
অশোককুমার গাঙ্গুলি ১৬

যদি মসজিদ ভাঙা না হত
মালিনী ভট্টাচার্য ১৯

অযোধ্যা: যাক ছিঁড়ে মিথ্যার জাল
আশীষ লাহিড়ী ২৫

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে
পেরেস্ত্রৈকা পর্ব: সংস্কৃতির রূপান্তর
অরুণ সোম ২৮

'বড়ো'দিনের সন্ধানে
দেবাঞ্জন বাগচী ২৯

লাইবেরিয়া— ছি ছি এত্তা জঞ্জাল
বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী ৩৪

বিনয় ঘোষ: অন্বেষী গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানী
দিলীপ সাহা ৪০

চিঠির বাক্সো ৫০

পুনঃপাঠ
মার্কসীয় দর্শনে শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা
সুকোমল সেন ৫১

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

Social Scientist

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তথ্যনির্ভর চিন্তাশীল প্রবন্ধসমষ্টি। বছরে ছ'টি সংখ্যা। কয়েক দশক ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

চাঁদার হার

এক বছর : ৩০০ টাকা
দুই বছর : ৫০০ টাকা
তিন বছর : ৬০০ টাকা

সম্পাদক

প্রভাত পট্টনায়ক

সম্পাদকমণ্ডলী

মধু প্রসাদ | উৎসা পট্টনায়ক | বি. রঘুনন্দন
সি. পি. চন্দ্রশেখর | জয়তী ঘোষ | বিশ্বময় পতি

সম্পাদকীয় দপ্তর

৩৫এ/১ শাহপুর জাট
নতুন দিল্লি ১১০০৪৯

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

হিন্দুরাষ্ট্র বনাম ধর্মনিরপেক্ষ ভারত

ভারতের স্বাধীনতা অর্জন বিশ্ব তথা আমাদের দেশের ইতিহাসে শুধুমাত্র এক যুগান্তকারী ঘটনা নয়, একই সঙ্গে তা ছিল অবিশ্বাস্য। ভারতের গরিব-গুরবো মানুষগুলি জাতপাত, ধর্মীয় বিভাজনের উর্ধ্বে উঠে, একতাবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করবে এই কথা ১৯৪৭ সালের মাত্র ৪০ বছর আগেও কেউ ভাবতে পারত না। এই ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামের কাণ্ডারীরা ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং মুসলিম লিগ ভারতের ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতিসত্ত্বাকে কোনোদিন স্বীকার করেনি। উভয় ধর্মের মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিরা ভারতে দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল। ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগ পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ করার আগেই সাভারকার ১৯৩৭ সালে আহমদাবাদ শহরে হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে বলেন যে ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দুই বৈরীতাপূর্ণ জাতির বাস। এরই সূত্র ধরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ভারতের জাতিসত্ত্বাকে সর্বদাই হিন্দুত্বের দ্বারা সংজ্ঞায়িত করেছে। মুসলিম লিগ এবং হিন্দু মহাসভা-আরএসএসের দ্বিজাতি তত্ত্বের পরিণামে ইংরেজরা ভারতের মানুষের উপর শেষ প্রতিশোধ হিসেবে দেশভাগ করে চলে যান, উপমহাদেশে দেশভাগের যন্ত্রণায় রক্তগঙ্গা বয়ে যায়।

তবু সেই রক্তস্নাত গভীর তমসাপূর্ণ রাতেও ভারতের তৎকালীন নেতৃত্ব দ্বিজাতি তত্ত্বকে খণ্ডন করে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ার সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁরা দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, হ্যাঁ ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়েছে, কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকবে না। ধর্ম-জাতি-লিঙ্গ-বর্ণ-বর্গ নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত নাগরিক সমান মর্যাদা পাবেন। হাজার হাজার বছরের অস্পৃশ্যতা, অবহেলা, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতের সংবিধানের এই সাম্যের বার্তা একদিকে যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যকে বহন করে, অন্যদিকে তা ভারতের মানুষের মধ্যে একতার ভিত্তি তৈরি করে এই মর্মে যে 'আমরা সবাই রাজা', অর্থাৎ আমরা সবাই সমানভাবে ভারতীয়।

তারপরে গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-নর্মদা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রে এমন একটি দল সরকার চালাচ্ছে যারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় একাগ্রচিত্তে ইংরেজদের পদলেহন করেছে, যারা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে কোনোদিন বিশ্বাস করেনি। সেই ব্রিটিশ পদলেহনকারী আরএসএসের উত্তরাধিকারী মোদী-অমিত শাহ সংসদে পাশ করলেন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। এই আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং

আফগানিস্তান থেকে আগত 'বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের' ৬ বছর ভারতে থাকলেই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে যদি তাঁরা 'হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-পার্সি-ক্রিস্টান-জৈন' ধর্মাবলম্বী হন। অর্থাৎ মুসলমান হলে এই তথাকথিত 'বেআইনি অনুপ্রবেশকারী'-রা নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ পাবেন না। বাকিরা পাবেন।

আইনটি সরাসরি ভারতের সংবিধানের মৌলিক ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর উপর এক ঐতিহাসিক কুঠারাঘাত। ভারতের সংবিধানে নাগরিকত্বের জন্য কোনো ধর্মীয় পরিচয়কে ভিত্তি করা হয়নি। ইজরায়েলের সংবিধান অনুযায়ী আপনি যেই দেশেই থাকুন না কেন, আপনি যদি ইহুদি হন, এবং ইজরায়েলের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন, আপনি তা পেয়ে যাবেন। অর্থাৎ, ইজরায়েলের সংবিধান ইহুদিদের বিশেষ শ্রেণির নাগরিকের মান্যতা দেয়। ভারতের সংবিধানে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব হতে পারে না। তদুপরি এই আইন সংবিধানের ধারা ১৪-র সরাসরি বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, যেখানে সমস্ত নাগরিককে সমানাধিকার দেওয়া হয়েছে ধর্ম নির্বিশেষে। যদি নাগরিকদের সমানাধিকারের ক্ষেত্রে ধর্ম কোনো ভিত্তি হতে না পারে, তা হলে নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রেও সাংবিধানিকভাবে ধর্মকে ভিত্তি করা যায় না। তাই বলা যায় যে এই বিলটি সম্পূর্ণভাবে সংবিধান বিরোধী।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য তা মানতে নারাজ। তাদের বেশ কয়েকটি যুক্তি রয়েছে যা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথম, ভারত ভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান সাংবিধানিকভাবে মুসলমান দেশ। এই দেশগুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হয় এবং সেখান থেকে ধর্মীয় উৎপীড়নে আগত অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের ভরসাস্থল ভারত। যেহেতু দেশগুলি মুসলমান প্রধান এবং রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম, তাই সেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো উৎপীড়ন নেই, অতএব তা নিয়ে সরকারের কোনো মাথাব্যথাও নেই। যুক্তিগুলি একটি পচা-গলা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ থেকে জন্ম নিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি যুক্তিই ভ্রান্ত। মতাদর্শের প্রশ্নে আমরা পরে আসব। আগে যুক্তিগুলির স্বরূপ উন্মোচন প্রয়োজন।

আমরা আগেই বলেছি যে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়েছে কিন্তু ভারতের স্থাপকেরা দ্বিজাতি তত্ত্বকে নাকচ করে দেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান প্রদান করেন। একথা ঠিক যে পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর উৎপীড়ন হয়েছে। তাঁরা যদি ভারতে এসে আশ্রয় নিতে চান, তবে তাঁদের নিশ্চিতভাবেই আশ্রয় দেওয়া উচিত। কিন্তু দুটি কথা এখানে বলতেই হবে। প্রথম, শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে মানুষের উপর উৎপীড়ন হয় না। বাংলাদেশের অগুনতি মানুষকে পাকিস্তানি খান সেনারা ধর্মের নামে হত্যা করেনি। করেছিল ভাষার নামে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম ধর্মের ভিত্তিতে নয়, হয়েছিল ভাষার ভিত্তিতে। আবার পাকিস্তান বা আফগানিস্তানে নারীদের উপর নানা উৎপীড়ন হয়। তাঁরা যদি ভারতে আশ্রয় নিতে চান, কিন্তু তাঁরা যদি ধর্মে মুসলমান হন তবে তাঁরা ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন না।

আরেকটি ডাহা মিথ্যা কথা সরকার বলছে, মুসলমানদের উপর নাকি এই দেশগুলিতে উৎপীড়ন হয় না। প্রথমত, ধর্মীয় উৎপীড়ন ছাড়াও অন্য উৎপীড়ন হওয়ার সম্ভাবনার কথা আমরা আগেই বললাম। কিন্তু ধর্মীয় উৎপীড়নও মুসলমানদের বিরুদ্ধে হয়। পাকিস্তানে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে ভয়াবহ উৎপীড়ন চলে, ধর্মের নামে। একইভাবে শিয়া মুসলমানরাও উৎপীড়নের শিকার হন। আবার আফগানিস্তানে হাজারা এবং শিয়া মুসলমানরা বরাবর তালিবানি উগ্রপন্থার শিকার। এই সমস্ত মানুষ ধর্মীয় উৎপীড়নের শিকার। কিন্তু এই আইন অনুযায়ী তাঁরা ভারতে নাগরিকত্ব পাবেন না, কারণ তাঁরা মুসলমান। এহেন একটি বিভেদমূলক আইন পাশ করিয়েছে দেশের সাংসদ।

অন্য একটি প্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক। যদি ভারত সরকার ধর্মীয় উৎপীড়নে পীড়িত ব্যক্তিদের ভারতে আশ্রয় দিতে চান, তবে শুধুমাত্র পাকিস্তান-বাংলাদেশ-আফগানিস্তানকে কেন বেছে নেওয়া হল। চিনে উইঘুর মুসলমানরা রাষ্ট্রের উৎপীড়নের শিকার হচ্ছেন, শ্রীলঙ্কায় তামিল হিন্দুরা সিংহলী জাতীয়তাবাদের বলি হয়েছেন বহু বছর, মায়ানমার বা বার্মায় রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণহত্যা করে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি ভারত সত্যিই মানবতার প্রতীক হয়ে উঠতে চায়, যদি সে সমস্ত উৎপীড়িতের ভরসাস্থল হতে চায়, তবে আইন করা উচিত ছিল যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে আগত সমস্ত উৎপীড়িত মানুষ যাঁরা ভারতে বেআইনি নাগরিক হিসেবে আছেন, আমরা তাঁদের নাগরিকত্ব দেব। স্বয়ং বিবেকানন্দ, যিনি আরএসএসের অতি প্রিয় হিন্দু সন্ন্যাসী, তাঁর বিখ্যাত শিকাগো

বক্তৃতায় বলেছিলেন যে তিনি এমন ধর্মে বিশ্বাসী, এমন দেশ থেকে আসছেন যেখানে যুগে যুগে ধর্মীয় কারণে উৎপীড়িতদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এইসব কথা ভাবলে বিজেপি-র চলবে না। তাদের আসল লক্ষ্য ধর্মীয়ভাবে উৎপীড়িত হিন্দুদের আশ্রয় দেওয়া নয়, তাদের আসল উদ্দেশ্য মুসলমানদের এই দেশের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পর্যবসিত করা।

উপরের লাইনগুলিকে বুঝতে হলে নাগরিকত্ব বিলকে নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে পড়তে হবে। অমিত শাহ বহু বার বলেছেন যে গোটা দেশে নাগরিকপঞ্জি শুরু করার আগে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ করানো হবে। কেন? কারণ যেই হিন্দুরা এনআরসি থেকে বাদ পড়বেন, তাঁদের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের মাধ্যমে প্রথমে 'বেআইনি অনুপ্রবেশকারী' ঘোষণা করে পরে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। অর্থাৎ নাগরিকপঞ্জি থেকে নাম বাদ পড়ার পরে একমাত্র মুসলমানরা কোনো প্রক্রিয়ায় ভারতের নাগরিকত্ব ফেরত পাবেন না। তাঁদের ঠাঁই হবে হয় 'ডিটেনশন ক্যাম্পে' অথবা তাঁদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে।

মাধব সদাশিব গোলওয়ালকার, যিনি আরএসএসের দ্বিতীয় প্রধান এবং গুরু নামে খ্যাত, তাঁর একটি নিবন্ধে বলছেন যে, ভারতবর্ষ হিন্দুদের। বাকি ধর্মের মানুষ (মুসলমান) দেশে থাকতে পারেন কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে, যেখানে তাঁদের হিন্দুদের কর্তৃত্ব মেনে থাকতে হবে এবং তাঁদের সীমিত অধিকার থাকবে। বর্তমান ভারতে নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি-র যৌথ আক্রমণের মধ্যে দিয়ে মোদী-শাহ গোলওয়ালকারের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার দিকে এগোচ্ছেন। তাই নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি-র বিরুদ্ধে লড়াই শুধুমাত্র বিজেপি বিরোধী লড়াই নয়। এই সংগ্রাম ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আত্মাকে বাঁচানোর লড়াই। এই সংগ্রাম গোলওয়ালকারের হিন্দু ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গান্ধী-নেহরু-রবীন্দ্রনাথের উদার ভারত বাঁচানোর লড়াই। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি যদি তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থের উপরে উঠে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের পক্ষে না দাঁড়ান তবে তাঁদের কোনো ক্ষমা নেই। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই নির্ধারিত হবে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র থাকবে না হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে। তাই এই লড়াই আমাদের জিততেই হবে।

অন্যায়, অন্যায় এবং অন্যায়

যুক্তি নয়। আবেগ। ন্যায় নয়। প্রতিহিংসা। এবং আইন নয়। জনগণ। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের নতুন কথামালায় আপনাদের স্বাগত। এখানে তাৎক্ষণিক স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ন্ত্রণ করে অপরাধ এবং তার শাস্তি, উভয়ের গতিমুখ। রক্তলোলুপ উন্মত্ত জনতাকে মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দেবার মতো করে উপহার দেওয়া হয় অপরাধীর মৃতদেহ। সর্বোপরি, আইন, সংবিধান, মিডিয়া এবং প্রশাসন, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এই প্রত্যেকটা স্তম্ভকেই বাঁকিয়ে চুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মধ্যযুগীয় কাঠামোতে, যার ফলে শেষ সত্য হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র জঙ্গলের রাজনীতিই। সেই রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হয় এবং ভাষ্য নির্মাণ করে ক্ষমতাসীন ট্রাইব, বর্তমান ভারতবর্ষ এক গভীর অসুখের নাম, যার শেকড় হিন্দুত্ববাদ অথবা রামমন্দির ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর বিস্তৃত। এই মুহূর্তে যে ন্যারেটিভ ভারতের সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তার উজ্জ্বলতম ভাষ্যকার দক্ষিণপন্থার ঠিকাদারেরা হলেও, সেই উজ্জ্বল সাফল্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক পাশাখেলার ফলাফলের মধ্যেই নিহিত নেই। শাসকের ভাবাদর্শ কীভাবে মানুষের ভেতরের অন্ধকার টেনে বার করে আনতে পারে, সাফল্য নিহিত সেখানেই।

একটি ধর্ষণ হল। ধর্ষিতাকে তারপর জ্বালিয়ে দেওয়া হল রাজপথে। আতঙ্কে শিউরে উঠল মানুষ। ঘটনার রেশ সমাপ্ত হবার আগেই অপর এক ধর্ষিতাকে টেনে হিঁচড়ে কুপিয়ে তার গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। নব্বই শতাংশ পুড়ে যাওয়া অবস্থায় মেয়েটি প্রায় এক কিলোমিটার দৌড়ে স্থানীয় থানাতে গেলেন। তারপর হাসপাতালে মারা গেলেন। গর্জে উঠল সাধারণ মানুষ। বদলার প্রত্যাশায় বিপুল ক্ষোভ আছড়ে পড়ল রাষ্ট্রের চৌকাঠে। এক ধর্ষিতার পরিবারের মানুষ দাবি তুললেন যে ধর্ষককেও একইভাবে রাস্তায় জ্বালিয়ে দিতে হবে। ঘটনার কয়েক দিনের মাথাতেই পুলিশ চারজন ধৃতকে নিয়ে গিয়ে এনকাউন্টার করে দিল। কারণ হিসেবে দেখানো হল, ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময়ে নাকি ধৃতরা পুলিশের উপর হামলা করেছিল। ফলাফল? সাধারণ মানুষের বিপুল অভিনন্দনে

ভেসে গেলেন সেই পুলিশকর্মীরা। এই আপাদমস্তক হরর গল্পের অবসানে হাতে কী থাকল? থাকল এই জনপ্রিয় দাবি যে প্রতিটা ধর্ষকের শাস্তি এভাবেই হোক।

বিচারবহির্ভূত এনকাউন্টার নিশ্চিতভাবেই খুবই চিন্তার। কিন্তু আরো গুরুতর প্রশ্ন ওঠে কারণ এই এনকাউন্টার একটি সামাজিক বৈধতা পেয়ে গেল, রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রী থেকে সেলিব্রিটি এবং মিডিয়ার একটা বৃহৎ অংশ দুই হাত তুলে অভিনন্দন জানালেন ঘটনাকে। আর তার থেকেও বড়ো সমস্যা এখানেই যে যাঁরা পুলিশকে অভিনন্দিত করলেন, তাঁরাও এটা জেনেই করলেন যে পুলিশি বয়ান সম্ভবত মিথ্যে। তাঁরা এটা স্পষ্টতই বুঝলেন যে পুলিশ ঠান্ডা মাথায় চারজন নিরস্ত্র মানুষকে খুন করেছে, এবং সেটার জন্যই পুলিশকে অভিনন্দিত করলেন তাঁরা। ঘটনার ভয়াবহতা এই মান্যতা দান করার জায়গাতেই। আইন বহির্ভূতভাবে পুলিশি খুনকে যে এভাবে বন্দিত করতে হয়, সেটা ভারতবর্ষ আগে দেখেনি।

কিন্তু আমরা পুলিশি বয়ানের সত্যতা উদ্‌ঘাটনের রাস্তায় যাব না। কারণ সেক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা থেকে যায় যে যেন পুলিশের বয়ান সত্যি হলে এই এনকাউন্টার ন্যায্য। এই প্রশ্ন তাই আপাতত তোলা থাক যে ভোর তিনটের সময়ে অপরাধ পুনর্নির্মাণের দরকার কেন পড়ল, কী করেই বা চারজন হাতকড়া পরানো ধৃত মানুষ বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা করল, আর কেনই বা পায়ে গুলি না করে শরীরের উর্ধ্বাংশে গুলি করা হল। এই সম্পাদকীয় আপাতত যে প্রশ্নটা করছে, তা হল, এর পর কী? এনকাউন্টারই যদি একমাত্র রাস্তা হয়, তা হলে উন্নাওয়ের অপর এক ধর্ষণে অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেংগার, অথবা বিজেপি-র একদা মন্ত্রী চিন্ময়ানন্দ, আশারাম বাপু, এইসব অপরাধীদেরও কি তা হলে এনকাউন্টার করা হবে? নাকি ক্ষমতা, অর্থ, সামাজিক প্রতিপত্তি এবং একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদস্পর্শ মাথায় আছে কি নেই, তার উপর নির্ভর করে স্থির করা হবে দোষীর ভাগ্য? আর তার থেকেও বড়ো কথা, এর শেষ কোথায়? ধর্ষিতার পরিবার দাবি তুলল যে ধর্ষককে জ্বালিয়ে দিতে হবে। তাই পুলিশ এনকাউন্টার করল। এরপর ইতিমধ্যেই এক মৃতের স্ত্রী দাবি তুলেছেন হত্যাকারী পুলিশকেও একইভাবে শাস্তি দিতে হবে। ধর্ষিতার পরিবারের আবেগকে সম্মান দিতে হলে এই নিহতের স্ত্রীয়ের আবেগকেও সম্মান দিতে হয়। তা হলে কি আবার সেই পুলিশকর্মীদের হত্যা করা হবে? তখন সেই পুলিশের স্ত্রী দাবি তুলবেন যে হত্যাকারীদের এনকাউন্টার করা হোক। এর শেষ কোথায়? ভারতবর্ষ মহাভারতের দেশ। মহাভারত যদি একটা শিক্ষাও দিয়ে থাকে, সেটা হল, প্রতিহিংসা চলতেই থাকে। কৌরবপক্ষের সাতজন মহারথী মিলে অভিমন্যুকে হত্যা করলেন। তার প্রতিশোধ নেবার জন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন হত্যা করলেন দ্রোণাচার্যকে। দ্রোণাচার্যের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য অশ্বত্থামা রাত্রের অন্ধকারে এসে পাণ্ডবদের পাঁচ সন্তানকে হত্যা করলেন। দ্রৌপদী প্রায়োপবেশনে বসে গেলেন অশ্বত্থামার রক্ত চেয়ে। মহাভারত দেখিয়ে গেছে যে এর কোনো শেষ নেই। আর নেই বলেই, দরকার পড়ে আইনের। রাষ্ট্রের। সংবিধানের।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, তা হলে কি ধর্ষিতার পরিবারের আবেগের মূল্য নেই? সহজ উত্তর হল, রাষ্ট্রের কাছে নেই। রাষ্ট্র সামাজিক ন্যায় দিতে বদ্ধপরিকর। তার দায় ধর্ষিতার পরিবারের কাছে যতটা, ধর্ষকের পরিবারের কাছেও ততটাই। সেখানে আবেগের মূল্য নেই। আর মানুষ চাইছে, পপুলার দাবি উঠেছে বলেই সেটাকে মান্যতা দিতে হবে, এই যুক্তিতে রাষ্ট্র চলতে পারে না। রাষ্ট্র কোনো হিট হিন্দি সিনেমার প্রযোজক নয় যে মানুষ আইটেম নাম্বার চাইলে আইটেম নাম্বার দেবে অথবা রক্তপাত চাইলে তিনটে খুন। রাষ্ট্র সেটাই করবে যা সংবিধান অনুযায়ী শ্রেয় ও ন্যায্য। এই শ্রেয়তার ধারণা থেকে রাষ্ট্র যদি সরে আসে, যদি সাধারণের দাবি মেনে জড়িয়ে যায় প্রতিহিংসার রাজনীতিতে, তা হলে তখনই তার কল্যাণকামী মুখটা নষ্ট হয়ে যায়। যারা ধরা পড়েছে, তাদের আইনমাফিক তদন্ত করে দোষী সাব্যস্ত করবার দায় রাষ্ট্রের। কিন্তু এই এনকাউন্টারের ঘটা দেখে একটা কূট প্রশ্নই মনে জাগছে। এরাই কি তা হলে আসল অপরাধী? যদি না হয়? যদি আসলদের আড়াল করবার জন্য সাততাড়াতাড়ি এরকম এনকাউন্টারের নাটক সাজানো হয়ে থাকে? প্রসঙ্গত, কয়েক বছর আগে ছত্তিশগড়ে কয়েকজন গ্রামবাসীকে এনকাউন্টার করেছিল সেখানকার স্থানীয় পুলিশ। দাবি করেছিল, তাঁরা মাওবাদী। সম্প্রতি তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে উঠে এসেছে যে সেই গ্রামবাসীদের সঙ্গে মাওবাদের কোনো যোগ ছিল না। তাঁরা ছিলেন সাধারণ নিরীহ মানুষ। আজ থেকে কয়েক বছর পর যদি এরকম কোনো সত্য এই চার জনের ক্ষেত্রে উঠে আসে, তার দায় কে নেবে?

এরকম ঘটনার তাত্ত্বিক জমি প্রসারিত হয় তখনই, যখন নেতা মন্ত্রীরা একে বৈধতা দেন। সংসদে জয়া বচ্চন যখন প্রকাশ্যে ধর্ষকদের মব লিঞ্চিং-এর ডাক দেন, যখন রাষ্ট্রপতি মন্তব্য করেন যে ধর্ষকের প্রাণভিক্ষার আবেদনের

অধিকার কেড়ে নেওয়া উচিত, ঠিক তখনই এই ধরনের এনকাউন্টার মান্যতা পেয়ে যায়। আর এর পেছনে অবশ্যই খেলা করে বিচারব্যবস্থার সীমাহীন ব্যর্থতাও। উল্লেখ্য, উন্নাওয়ের যে ধর্ষিতাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হল, তাঁর স্টেটমেন্টই প্রথমে পুলিশ নিতে চায়নি। তার পরেও তাঁকে দীর্ঘদিন ঘুরিয়েছে আইন এবং আদালত। উন্নাওয়ের অপর ধর্ষক কাণ্ডে জড়িত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেংগারের সাঙ্গোপাঙ্গরা মিলে ধর্ষিতার মা, কাকিমা এবং কাকা-কে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে। প্রাণনাশের চেষ্টা চালিয়েছে মেয়েটির উপরেও। তারপরেও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। উন্নাওতে গত এগারো মাসে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ছিয়াশিটি। শ্লীলতাহানির ঘটনা দেড়শোরও বেশি। একদিকে প্রশাসন, আইন এবং বিচারব্যবস্থার ধ্বসে পড়া এবং অন্যদিকে সমান্তরাল রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে ধীরে ধীরে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জঙ্গলের রাজনীতির উঠে আসা, এই দুইয়ে মিলে এই মুহূর্তে মব জাস্টিসই তাই মূল নির্ণায়ক হয়ে দেখা দিয়েছে।

বারবার যেটা বলার, মানুষ চাইছে তাই মানুষকে দিতে হবে, এই দায় রাজনৈতিক দলের থাকতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের থাকতে পারে না। এই মব জাস্টিস, এবং মব লিঞ্চিং আসলে গণপিটুনি অথবা ডাইনি হত্যার মতো জিনিসেরই এক প্রসারিত রূপ। ধর্ষণ ঘৃণ্য অপরাধ, তাই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকবার কথা নয়। ধর্ষকের চরমতম শাস্তি কাম্য কি না, মৃত্যুদণ্ড চাই কি না সেই তর্কও আপাতত থাক। কিন্তু বিচার বহির্ভূতভাবে ধর্ষকের হত্যার ফলে রাষ্ট্র আর হত্যাকারী, এই দুইয়ের মধ্যে কোনো তফাত করতে পারা যাচ্ছে না। যেটা দরকার ছিল— দ্রুত তদন্ত, বিচার এবং প্রয়োজনীয় শাস্তি, সেগুলোকে এড়াবার জন্যই যেন এত আয়োজন, হিংস্র মবের কাছে আত্মসমর্পণ।

ভারতের বর্তমান শাসক দলটির শত্রু-রাষ্ট্র হিসেবে যাদের চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, পাকিস্তান, ইরান বা আফগানিস্তান অথবা সৌদি আরব, সেখানে এমনভাবেই বিচার হয়। পাথর ছুঁড়ে হত্যা নামক মব লিঞ্চিং সেই দেশগুলির শরিয়তি আইনের উজ্জ্বল অংশ। ভারতবর্ষ আপাতত শত্রুর বিরোধিতা করতে করতে নিজেই সেই শত্রুদের মতো হয়ে উঠছে। কিন্তু তবুও, ইবসনের এনিমি অফ দি পিপল নাটকের ডক্টর গ্রসম্যান যেরকম উপলব্ধি করেছিলেন— সবথেকে শক্তিশালী হল সে, যে একা দাঁড়াবার সাহস রাখে— ঠিক সেভাবেই এই সম্পাদকীয় একা হয়ে যাবার ঝুঁকি নিয়েও প্রয়োজনীয় কথাটুকু উচ্চারণ করবেই। এবং এই দেশের সমস্ত মানুষ যদি পুলিশকে অভিনন্দন জানিয়েও থাকেন, যদি বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়েন, তার পরেও নিঃসঙ্গ অবস্থানে দাঁড়িয়েও এই সম্পাদকীয় সেটাই বলবে, যা সে শিখেছে ভারতের সংবিধানের কাছ থেকে। রাষ্ট্র আর হত্যাকারী, দুজনে কখনো এক দাঁড়িপাল্লায় বসতে পারে না। রাষ্ট্র ভাড়াটে খুনির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে তার থেকে ভয়ংকর আর কিছু নেই। আর তাই এই এনকাউন্টার অন্যায়, অন্যায় এবং অন্যায়।

নিবেদন

আমরা সময়ের বিপক্ষে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে *আরেক রকম*-এর দাম গত ৭ বছর একই রেখেছিলাম, ২০ টাকা। কিন্তু অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে পত্রিকার দাম জানুয়ারি ২০২০ থেকে ৩০ টাকা করতে হচ্ছে। এই সঙ্গে বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা হবে ৭০০ টাকা। আশা করি পাঠকসমাজের সহমর্মিতা থেকে এই পত্রিকাটি বঞ্চিত হবে না।

সমস্ত প্রকার সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে বামপন্থা, সাম্য, প্রগতি ও যুক্তিবাদী মানসিকতার স্বার্থে পত্রিকাটি প্রকাশ করে যেতে আমরা বদ্ধপরিকর।

সম্পাদকমণ্ডলী
আরেক রকম

সমসাময়িক

ক্রয়ক্ষমতার ক্ষয়

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফসল ভারতের পরিসংখ্যান দপ্তর যার মধ্যে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা তাঁর প্রধান অবদান হিসেবে বিশ্বে সমাদৃত। পৃথিবীতে প্রথম বড়ো আকারের নমুনা সমীক্ষার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত তথ্যকে খুঁজে তাকে গ্রহণযোগ্যভাবে পেশ করার পদ্ধতি ভারতে বাস্তবায়িত হয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে গোটা পৃথিবীতে ভারতে তৈরি হওয়া এই পদ্ধতি চালু হয়। বলা যেতে পারে মানুষের জীবনমান পরিমাপের অর্থনীতি ও সংখ্যাতত্ত্বে ভারত পথিকৃৎ।

আজ ভারতের এই মহান প্রতিষ্ঠানের মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে মোদী সরকার। প্রথমে ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি পরিমাপের পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক হয়, তারপরে বেকারত্বের হার বিগত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ হওয়ায় কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সমীক্ষা রিপোর্টকে চেপে দেওয়া হয়। এবার পালা ভারতের দারিদ্র্য মাপার একমাত্র তথ্যভাণ্ডার জাতীয় নমুনা সমীক্ষার। এই সমীক্ষার দ্বারা সংগৃহীকৃত গৃহস্থের ভোগব্যয় সংক্রান্ত তথ্যকে সরকার জনসমক্ষে প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছে। কারণ সমীক্ষার তথ্য সরকারের পছন্দ হয়নি।

প্রথমে বোঝা দরকার এই সমীক্ষা কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে। এই সমীক্ষায় প্রশ্নকর্তারা আপনার বাড়িতে এসে আপনার সংসার খরচ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে। যেমন আপনি কত টাকা খাদ্যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যে, বাড়ি ভাড়ায় বা বস্ত্রে খরচ করেছেন তার হিসেব নেওয়া হয়ে থাকে। আবার খাদ্যের মধ্যে কী কী খাদ্য আপনার পরিবার বিগত এক মাসে খেয়েছে তার তথ্যও সংগৃহীত হয়। এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি গৃহস্থের গড়ে মাথাপিছু মাসিক ভোগ্যপণ্য খরচ গণনা করা হয়। এই মাসিক খরচকে আমরা গৃহস্থের জীবনমানের একটি সূচক হিসেবে দেখতে পারি। কারণ আপনার পরিবারের মাথাপিছু মাসিক খরচ যদি আমার থেকে বেশি হয়, তবে আপনি আমার থেকে বেশি প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভোগ করছেন। তাই এই মাসিক খরচের হিসেব খুব গুরুত্বপূর্ণ। এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে ভারতের কত মানুষ দারিদ্র্য রেখার নীচে আছেন তার গণনাও এই মাসিক খরচের ভিত্তিতেই করা হয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে একটি দারিদ্র্য রেখার গণনা করা হয়, যা আদতে একটি টাকার অঙ্ক। আপনার মাথাপিছু মাসিক খরচ যদি এই দারিদ্র্য রেখার টাকার অঙ্কের থেকে কম হয় তবে আপনি দরিদ্র হিসেবে গণ্য হবেন।

২০১৭-১৮ সালে শেষবার এই সমীক্ষা করা হয়। তার রিপোর্ট সরকারিভাবে প্রকাশিত হওয়ার আগেই সংবাদ মাধ্যমে ফাঁস হয়। এই ফাঁস হওয়া রিপোর্ট থেকে একটি ভয়াবহ চিত্র উঠে আসে। দেখা যাচ্ছে যে ভারতে ১৯৭২-৭৩ সালের পরে প্রথমবার মাথাপিছু গড় মাসিক ভোগ্যপণ্যের উপর খরচ কমেছে। ২০১১-১২ সালে একজন ব্যক্তি গড়ে ১৫০১ টাকা মাসে ভোগ্যপণ্যে খরচ করতেন যা ২০১৭-১৮ সালে কমে হয়েছে ১৪৪৬ টাকা (২০০৯-১০ সালের মূল্যে দুই বছরের ভোগ্যপণ্যের খরচ মাপা হয়েছে)। অর্থাৎ, ভারতে বসবাসকারী একজন গড় মানুষের খরচ বিগত ৬ বছরে কমে গিয়েছে, যা দেখায় যে মানুষের দুর্দশা বেড়েছে, তাঁদের হাতে টাকা নেই, সুতরাং তাঁরা তাঁদের জীবনমান বজায় রাখতে পারছেন না, খরচ কমাতে বাধ্য হচ্ছেন।

এই তথ্যকে যদি আরো গভীরে গিয়ে পর্যালোচনা করা যায় তবে ভারতের আর্থিক সংকটের প্রকৃত চিত্রটি ফুটে উঠবে। ২০১১-১২ সালে গ্রামীণ ভারতে গড়ে একজন মানুষ মাসে খরচ করত ১২১৭ টাকা, যা ২০১৭-১৮ সালে কমে হয়েছে ১১১০ টাকা (২০০৯-১০ সালের অর্থমূল্যে)। অর্থাৎ, এই ৬ বছরের মধ্যে গ্রামীণ ভারতে ভোগ্যপণ্যের উপর খরচ কমেছে ৮.৮ শতাংশ। একই সময় শহরাঞ্চলে এই খরচ বেড়েছে ২ শতাংশ। সুতরাং গ্রামীণ ভারতের সংকট শহুরে ভারতের থেকে তীব্রতর এবং সেখানকার মানুষের ক্রয়ক্ষমতার এই বিপুল সংকোচন স্বাধীনোত্তর ভারতে একটি বিরল ঘটনা।

এই প্রক্রিয়ার ভয়াবহতা বুঝতে হলে আমাদের আরেকটি তথ্যের দিকে তাকাতে হবে। ভোগ্যপণ্যের খরচের বিবিধ ভাগের মধ্যে সাধারণত খাদ্যের খরচ প্রকৃতভাবে কমে না,

কারণ গরিব ও প্রান্তিক মানুষ এমন অবস্থাতে জীবনযাপন করেন যেখানে খাদ্যের উপর খরচ আরো কমলে অনাহারে থাকতে হবে। তবু দেখা যাচ্ছে যে ২০১১-১২ এবং ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে গ্রামীণ ভারতে খাদ্যের উপর প্রকৃত খরচ (২০০৯-১০-এর মূল্যে) কমেছে ৯.৮ শতাংশ আর শহুরে ভারতে তা অতি সামান্য, ০.২ শতাংশ, বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ, গ্রামীণ ভারতের মানুষ তাঁদের খাদ্যের উপর খরচ প্রায় ১০ শতাংশ কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছেন আর শহরের মানুষও খাদ্যের উপর খরচ বৃদ্ধি করেননি বললেই চলে। আধুনিক ভারতে, একুশ শতাব্দীর ভারতে আমাদের দেশের জনগণ খাদ্যের উপর খরচ কমাতে বাধ্য হচ্ছেন, এর থেকে আর লজ্জার কথা কী হতে পারে?

দ্বিতীয়ত, যেহেতু ভারতের দারিদ্র্য এই মাসিক খরচের ভিত্তিতে নিরূপণ করা হয়, এই খরচ কমে গেলে বলা যেতে পারে যে ভারতে দারিদ্র্য বেড়েছে। বিগত কিছু বছরে ভারতে দারিদ্র্যের ছবি এক নম্বর সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি ১ : ভারতে দারিদ্র্য

(জনসংখ্যার শতাংশ হিসেবে)

বছর	গ্রামীণ	শহর	মোট
১৯৯৩-৯৪	৫০.১	৩১.৮	৪৫.৩
২০০৪-০৫	৪১.৮	২৫.৭	৩৭.২
২০১১-১২	২৫.৭	১৩.৭	২২
২০১৭-১৮	২৯.৬	৯.২	২২.৮

সূত্র : India's Rural Poverty has Shot up, *Livemint*, 3 December 2019

সারণি ১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২০০৪-০৫ থেকে লাগাতার ভারতে দারিদ্র্য সীমার নীচে থাকা মানুষের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে কমেছে। কিন্তু ২০১১-১২ এবং ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে গ্রামীণ ভারতে দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৪ শতাংশ বিন্দু। দারিদ্র্য সীমার নীচে মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া ভারতের তো বটেই গোটা পৃথিবীর ইতিহাসেই প্রায় নজিরবিহীন। নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন দেশকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দেবেন। বাস্তবে দেখা গেল যে তাঁর আমলে দেশে গরিব মানুষের সংখ্যা কয়েক কোটি বেড়ে গেছে। এখানে অবশ্য বলে রাখা ভালো দারিদ্র্য রেখা নিয়ে প্রবল বিতর্ক রয়েছে। দারিদ্র্য রেখা বলতে আমাদের দেশে যা চালু আছে তা টাকার পরিমাণে খুবই কম। তবু দারিদ্র্য বাড়ছে যা দেশের অর্থব্যবস্থায় এক গভীর অসুখের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এই অসুখের অনেকগুলি উপসর্গ রয়েছে। তার প্রধান উপসর্গটি অবশ্যই কৃষি সংকট। কৃষি আজকের দিনে আর লাভজনক নয়, চাষিরা ফসলের দাম পাচ্ছেন না, লাখো কৃষক আত্মহত্যা করেছেন এ সবই জানা কথা। বাড়তি যা জানার তা হল এই যে কৃষিক্ষেত্রে মোট প্রকৃত আয় বিগত কিছু বছরে কমছে। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে কৃষিক্ষেত্রে আয়ের সংকট রয়েছে। কিন্তু বড়ো জমিদার বা ধনী কৃষকদের আয় কমে না। তবু সামগ্রিকভাবে কৃষিতে প্রকৃত আয় কমার অর্থ প্রান্তিক ও গরিব চাষিদের আয়ের ব্যাপক সংকোচন। তারই ফলশ্রুতি কৃষক আত্মহত্যা, মুম্বাইয়ের লং-মার্চ বা গ্রাম থেকে নিরন্তর শহরের দিকে চলে আসা অদক্ষ শ্রমিকের ঢল। কিন্তু শিল্প নেই, কাজ নেই। অতএব হু হু করে বাড়ছে বেকারত্ব। তাই কৃষি ছেড়ে যাব বলা সহজ কিন্তু মানুষ যাবে কোথায়? এই কৃষি থেকে বিস্থাপিত এবং শিল্পে কাজ না পাওয়া শ্রমিকদের একটাই আশ্রয়স্থল অসংগঠিত ক্ষেত্র। সবজি বিক্রি করে, ছোটো দোকান চালিয়ে, চা বিক্রি, হকারি ইত্যাদি করে পেট চালানো। এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের পেটে শেষ লাথিটি মেরেছে নোট-বাতিল এবং জিএসটি। যেহেতু এই ক্ষেত্রের অধিকাংশ ব্যাবসা নগদ নির্ভর এবং করের জালের বাইরে, নোট বাতিল এবং জিএসটি এদের কোমর ভেঙে দিয়েছে। কৃষি সংকট, বেকারত্ব, অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ইত্যাদির পরিণতিতে মানুষ নিজেদের ব্যয় কমাতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ আয় বাড়ার জায়গায় প্রচুর মানুষের আসলে আয় কমেছে। ২০১৭-১৮ সালের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে মানুষের জীবন সংকটের এই নিদারুণ ছবি।

কিন্তু মোদী সরকার মানুষের জীবনজীবিকা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়। বরং মন্দির-মসজিদ-হিন্দু-মুসলমান-গোমাতা-এনআরসি ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে বিষ ছড়াতে তারা বেশি পারদর্শী। তাই এই সমীক্ষা রিপোর্টটিকে তারা বাতিল করেছে। সরকারি আমলারা যুক্তি দিচ্ছেন যে সমীক্ষাটির তথ্যের মান নিয়ে নাকি প্রশ্ন আছে, তাই তাঁরা রিপোর্ট ও তথ্য প্রকাশ করবেন না। শুনে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। খবরে প্রকাশিত হয়েছে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি তথ্যের মান নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে যে সমীক্ষা হল তার ফলাফল পছন্দ না হলে তাকে চেপে দিতে হবে এই নীতি অগণতান্ত্রিক এবং ভারতের পরিসংখ্যান ব্যবস্থার জন্য প্রবল ক্ষতিকর। সরকার যুক্তি সহকারে বলতেই পারেন যে তাঁরা সমীক্ষার রিপোর্ট মানেন না। কিন্তু তথ্য একটি সর্বজনীন পণ্য যা জনগণের টাকায় তৈরি হয়েছে। সেই তথ্য প্রকাশ করে সরকার জনগণ এবং গবেষকদের সুযোগ দিক তথ্যের যাথার্থ্যতা যাচাই করার। বিতর্ক চলুক তথ্যের মান ও সংখ্যা নিয়ে। গণতন্ত্রের এটাই তো দস্তুর— বিতর্কের মাধ্যমে সমাজের ও মানুষের কল্যাণ। কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাস করলে

মোদীর ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ছাতির গর্ব বোধহয় টলে যায়। তাই সমীক্ষা রিপোর্ট সরকারের না-পসন্দ অতএব অপ্রকাশিত, পরবর্তী সমীক্ষা হবে ২০২১ সালে রিপোর্ট আসবে ২০২২ সালে। দেশের মানুষ ততদিন অপেক্ষা করুন জানতে যে দেশে দারিদ্র্য বাড়ল না কমল!

তবে সমীক্ষা যদি সঠিক চিত্র তুলে ধরে তবে মোদী সরকারের কপালে দুঃখ আছে। মানুষের হাতে ক্রয়ক্ষমতা নেই, তাঁরা খাদ্য কিনতে পারছেন না আর তাঁদের ভোলানোর জন্য মন্দির-মসজিদ-হিন্দু-মুসলমান-এনআরসি-র রাজনীতি খুব বেশি দিন হালে পানি পাবে না। অর্থব্যবস্থায় সংকট থাকলে তার রাজনৈতিক আঘাত শাসক দলের গায়ে লাগবে বই কী। কিন্তু তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হবে না। বিরোধী দলগুলিকে রাস্তার লড়াই আন্দোলনে থাকতে হবে, মানুষের কাছে গিয়ে তাদের কথা বলতে হবে, তাদের থেকে শুনতে হবে। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সাহসী লড়াইয়ের প্রতীক্ষায় জনসাধারণ। বিরোধীরা বুঝতে পারছেন কি?

মালিকের হাত শক্ত করো!

আইন মেনে আইন অমান্য করার সুযোগ রেখে 'শিল্পসংস্থায় মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক বিধি ২০১৯' বিল লোকসভায় পেশ করা হল। এই বিল নিয়ে এখনও বিস্তারিতভাবে সংসদীয় আলোচনা শুরু হয়নি। তবে প্রস্তাবিত সম্পর্ক-বিধির প্রাথমিক খসড়া পরিবেশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের শ্রম-সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট আশঙ্কার পরিসর তৈরি হয়েছে।

প্রস্তাবিত বিল সংখ্যাধিক্যের দাপটে আইনে পরিণত হলে মালিকের হাত আরো শক্তিশালী হয়ে যাবে। বর্তমানে একশো বা তার বেশি কর্মীর সংস্থায় কর্মী ছাঁটাইয়ের জন্য সরকারি অনুমতি লাগে। বিলে তা বাড়ানো হয়নি। কিন্তু পরে যাতে সরকার ইচ্ছেমতো সংসদকে এড়িয়ে ওই সংখ্যার হেরফের করতে পারে, সেই রাস্তা খোলা রাখা হয়েছে।

সরকারের দাবি, নতুন বিধি কার্যকর হলে স্থায়ী কর্মীদের সঙ্গে ঠিকা কর্মীদের সুযোগ-সুবিধার ফারাক কমবে। ঠিকা কর্মীরা ইপিএফ-ইএসআই সহ বিভিন্ন সুবিধা পাবেন বলে বিলে বলা হয়েছে। এখন মূল বেতনের ১২% কাটা হয় ইপিএফ খাতে। তার সমান টাকা দেয় সংস্থা। কিন্তু তিন বা ছয় মাস পর কাজ না থাকলে ইপিএফ খাতের টাকা কীভাবে জমা পড়বে? বিল নিরুত্তর। আশঙ্কা হয়, এই বিলে ইপিএফ, ইএসআই-কেও বেসরকারি পরিচালনার দিকে ঠেলে দেওয়ার সলতে পাকানো হচ্ছে।

এই অজুহাতে অনেক সহজে স্বল্প সময়ের জন্য ঠিকা কর্মী নিয়োগ এবং তাঁদের ছাঁটাইয়ের দরজা খুলে যাবে। প্রচলিত বিধি অনুসারে ঠিকা কর্মী নিয়োগের জন্য ঠিকাদারের উপরে নির্ভর করতে হয়। প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী সংস্থাই সরাসরি তিন-ছমাসের জন্য ঠিকায় কর্মী নিয়োগ করতে পারবে। এর ফলে স্থায়ী চাকরির সংখ্যা কমে যাবে। ঠিকায় নিয়োগের প্রবণতা বাড়তেই থাকবে।

বিশ্বায়নের জমানায় সরকারি ক্ষেত্র বাদে স্থায়ী চাকরি এখন এমনিতেই সেভাবে নেই। সরকারি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় শূন্য পদে নিয়োগ প্রায় বন্ধ। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির দ্রুত বি-রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কাজে সরকার ব্যস্ত। প্রস্তাবিত বিল আইনে রূপান্তরিত হলে সর্বত্র ঠিকা কর্মী নিয়োগের প্রবণতা বাড়তে থাকবে। প্রস্তাবিত বিলে ঠিকা কর্মীর চুক্তির পুনর্নবীকরণ না-হলে তাকে ছাঁটাই হিসেবে না-দেখার কথাই বলা হয়েছে। অন্তত ৭৫% কর্মীর সমর্থন থাকলে, তবেই কর্মীদের সংগঠনের ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। বিলের খসড়ায় ধর্মঘটের অধিকারকে যেভাবে খর্ব করার কথা বলা হচ্ছে তাও শ্রমিক বিরোধী। আইন মেনে ধর্মঘট না ডাকলে জেল-জরিমানার কথা বলা হচ্ছে। ফলে ধর্মঘটের অধিকারই হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

সংসদকে এড়িয়ে শুধু প্রশাসনিক নির্দেশিকার মাধ্যমে তা বদলানোর রাস্তা খোলার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষার জন্য টাকা কোথা থেকে আসবে, তা-ও স্পষ্ট নয়। সদ্য লোকসভায় পেশ হওয়া 'শিল্পে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক বিধি'-র জেরে সহজে ছাঁটাইয়ের দরজা খুলে যাবে। ঠিকায় নিয়োগের প্রবণতা বাড়তে থাকবে। স্থায়ী চাকরির সংখ্যা ক্রমশ তলানিতে ঠেকবে। কর্মীদের দর কষাকষির ক্ষমতা হারিয়ে যাবে। ফলে এই বিল পাশ হলে কাজের বাজারে অনিশ্চয়তা বাড়বে। সামগ্রিকভাবে কর্মীদের ব্যক্তিজীবন সবসময়ই একটা চাপের মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়ে যাবে। এক অদ্ভুত মানসিক ত্রাস নিয়ে কোনো কর্মীর পক্ষে কি নিশ্চিতরূপে নিজের কাজ করা সম্ভব? প্রতিটি কর্মীর প্রতি মুহূর্তে কাজ খোয়ানোর দুর্ভাবনা সামগ্রিকভাবে সমাজে এক অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। সবমিলিয়ে অর্থনীতির দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা আরো ক্ষীণ হবে।

প্রায় একই সময়ে সর্বস্তরের আপত্তি সত্ত্বেও কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা বিধিতে সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। গোড়া থেকেই সরকারের দাবি, পুরোনো আইন বদলে এই বিধি

তৈরির মূল লক্ষ্য, সব কর্মীকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা দরকার। বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। অ্যাপ-ক্যাব চালক থেকে শুরু করে অ্যাপ-নির্ভর সংস্থার পণ্য পৌঁছনোর কর্মী (ডেলিভারি পার্সন)— সকলকে পুরোদস্তুর কর্মীর স্বীকৃতি দিয়ে ইপিএফ, ইএসআই, বিমা-সহ প্রাপ্য নানা সুবিধা দেওয়া এতে সম্ভব হবে বলে জানানো হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ছুটিতে 'সম্পূর্ণ বেতন ও সুবিধা' পাওয়ার পথ মসৃণ করার কথাও এই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে। সরকারি মুখপাত্র সাংবাদিক সম্মেলনে সব কর্মীকে সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার দাবি করলেও, লিখিত খসড়ায় তার প্রতিফলন নেই। একই সঙ্গে যেভাবে ইপিএফ, ইএসআই-কে কর্পোরেট ধাঁচে ঢেলে সাজানোর কথা বলা হচ্ছে, তাও শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী।

কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফ) ও তুলনায় কম বেতনের শ্রমিকদের জন্য নিখরচায় চিকিৎসার বন্দোবস্তের (ইএসআই) দিকে এই বিধি যেভাবে হাত বাড়াতে চাইছে তা যথেষ্ট আপত্তিকর। এই দুই প্রকল্পের তহবিল মূলত কর্মী ও নিয়োগকর্মীদের টাকায় তৈরি। তা ছোটোখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও মসৃণভাবে চলেছে। কিন্তু পুরো উৎপাদন ও পরিষেবা ব্যবস্থাটাই ঠিকাকর্মী ভিত্তিক হয়ে গেলে চুক্তির মেয়াদ শেষে যখন কর্মীর কাজই থাকবে না তখন ইএসআই এবং ইপিএফ-এর টাকা কে জমা দেবে। ফলে কিছুদিন বাদে ইএসআই এবং ইপিএফ-এর স্বাভাবিক মৃত্যু অবধারিত। পক্ষান্তরে এখনকার যে সব শ্রমিক-কর্মী সামাজিক সুরক্ষা জালের বাইরে রয়েছে তাদের জন্য ইপিএফ, ইএসআই, বিমার মতো সুরক্ষার ব্যবস্থা করার বিষয়ে কেন্দ্র নজর দেয়নি। বিড়ি শ্রমিক, নির্মাণ কর্মী থেকে শুরু করে সকলের চাহিদা মাফিক সুরক্ষা-জাল তৈরির বদলে 'সকলের জন্য এক মাপের জুতো' তৈরির চিন্তা মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। শিল্পের চরিত্রের ভিত্তিতে শ্রমিকদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী সুরক্ষার ব্যবস্থা না-করে, সকলের জন্য সমান বন্দোবস্ত তৈরির চিন্তাই সঠিক নয়।

বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতায় এগোতে সংস্থাগুলি এমনিতেই খরচ কমাতে মরিয়া। শ্রমিক-কর্মীদের বেতনে কোপ পড়ছে। তার উপরে কোণঠাসা অর্থনীতিতে বহু কর্মী কাজ খোয়ানোয় মজুরি নিয়ে দর কষাকষির পরিসর আরো কমেছে। এই অবস্থায় আইন মালিকের দিকে এক তরফা হলে, অর্থনীতি তো বটেই সামাজিক সমস্যা আরো বাড়তে পারে।

মূল্যবৃদ্ধির কামড় যাতে আয়ের বড়ো অংশকে খেয়ে না-ফেলে, তা নিশ্চিত করতে গত কয়েক বছর ধরে তার হার বেঁধে রাখায় জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। রোজগারের জায়গায়ই নড়বড়ে হয়ে গেলে আর প্রকৃত আয় কীভাবে ঠিক থাকবে? কাজের সুযোগ পেলে তবেই মানুষের হাতে টাকা আসবে। একে দেশে এখন চাকরি বাড়ন্ত। তার উপরে ছাঁটাইয়ের সুযোগ বাড়লে কাদের কেনাকাটায় ভর করে চাঙ্গা হবে চাহিদা? কাজের নিশ্চয়তা যত বেশি, সাধারণত তত নিশ্চিন্তে কেনাকাটা করেন মানুষ। ঠিকায় নিয়োগ বাড়লে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভরসায় বাজারমুখী হওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রয়োজনের বাইরের কেনাকাটায় কোপ পড়তে বাধ্য। উন্নত দেশের মতো নিখরচায় চিকিৎসা-শিক্ষা বা বেকারত্ব ভাতার মতো সুরক্ষা-কবচ যেখানে নেই সেই দেশের পক্ষে অস্থায়ী ঠিকাচুক্তিভিত্তিক নিয়োগ আসলে শ্রমিক-কর্মীদের সংগঠিত না হতে দেওয়ার এক নিদানপত্র। এমনিতেই আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন বা আই এল ও-র অনেক বিধি আমাদের দেশে রূপায়িত হয় না। গত এক দশকে ধর্মঘট, কর্মী বিক্ষোভও চোখে পড়ার মতো কমেছে। তার উপরে এই বিল পাশ হলে, শ্রমিকদের আরো কোণঠাসা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে বাধ্য।

ইম্পিচমেন্টের মুখে ট্রাম্প

ডনাল্ড ট্রাম্পের এ ভারী অন্যায়। আমরা গরিব ভারতীয়রা, এমনকী বাঙালিরাও, চিরকালই আমেরিকার গুণমুগ্ধ। যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ খ্যাত ম্যাকনামারাকে 'গো ব্যাক' বলেছি তখনও। আমার সন্তান থাক দুধে-ভাতের অর্থই তো আমার সন্তান যেন থাকে আমেরিকাতে। ওই স্বর্গরাজ্যে আমাদের ছেলে অভিজিত বিনায়ক বা সুন্দর পিচাই না হতে পারলেও, অঢেল দুধ-ভাত তো পাবে। আর ট্রাম্প কিনা সেই আমেরিকাকে ভারত বানিয়ে ফেলছে। না, না, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বা ওই সব কিছুতে আমেরিকা এখনও আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে কিন্তু একটা ক্ষেত্রে আশ্চর্যরকমের, না, বলা উচিত, ভয়াবহ রকমের মিল দেখা যাচ্ছে দু দেশের মধ্যে।

এই দেখুন না, মার্কিন রাজনীতির এখন সবচেয়ে জবর খবর হচ্ছে তাদের রাষ্ট্রপতি ডনাল্ড ট্রাম্পের আশু অভিশংসন বা ইম্পিচমেন্ট। মার্কিন ইতিহাসে এই নিয়ে তিন নম্বর প্রেসিডেন্ট যাঁকে আইনি কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। তিনি যেহেতু রাষ্ট্রপতি তাই আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে, তাঁর কাছে জবাবদিহি চাইতে পারে কেবল মার্কিন কংগ্রেস বা সংসদ। কংগ্রেসের আবার দু ভাগ, হাউস অফ রেপ্রেসেন্টেটিভস, কিছুটা

আমাদের লোকসভার মতো, আর সেনেট, কিছুটা (তবে কিছুটাই) আমাদের রাজ্যসভার মতো। তা সেই হাউস অফ রেপ্রেসেন্টেটিভস কয়েকদিন ধরে তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ডনাল্ড ট্রাম্পকে ইম্পিচ করার মতো যথেষ্ট তথ্য তাদের হাতে আছে। অতএব সে লক্ষ্যে তারা এগিয়ে যাচ্ছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে যার ভিত্তিতে আলোচনা, জেরা, ভোটাভুটি, ইত্যাদি হবে। যে বিচার-বিতর্ক প্রকাশ্য টেলিকাস্টও করা হবে।

নাটকের সব উপাদানই আছে, নেই শুধু কোনো উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ। কারণ শেষ অঙ্কে কী হবে সকলেরই জানা। কিছুই হবে না, ট্রাম্প হাসতে হাসতে আরো প্রবল উৎসাহে টুইট করে যাবেন। কারণ হাউস অফ রেপ্রেসেন্টেটিভস ইম্পিচমেন্টের কার্যক্রম শুরু করতে পারলেও, ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে একমাত্র সেনেট। এবং হাউসে যেমন ডেমোক্র্যাট দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সেনেট আবার ট্রাম্পের দল রিপাব্লিকানদের হাতে। তাই হাউস ইম্পিচ করার সিদ্ধান্ত নিলেও ইম্পিচ করার ক্ষমতা তাদের নেই। সেটা পারে শুধু সেনেট এবং সেনেট তাদের রাষ্ট্রপতির পিছনে এককাট্টা।

একেবারে গোড়া থেকে। যেদিন, মাত্র মাস দুয়েক আগে, একজন নাম-প্রকাশে-অনিচ্ছুক সরকারি কর্মী ফাঁস করে দেয় যে ডনাল্ড ট্রাম্প নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইউক্রেনকে অন্যায্য চাপ দিয়েছিলেন, ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির যেলেন্সকিকে শাসিয়েছিলেন যে মার্কিন সরকারের প্রতিশ্রুত অনুদান দেবেন না, হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানাবেন না যদি না প্রতিদানে যেলেন্সকি ট্রাম্পের সম্ভাব্য নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বী, ডেমোক্র্যাট দলের জো বাইডেনের ছেলের ইউক্রেনে ব্যাবসার তদন্ত করেন এবং, সেই সঙ্গে, প্রকাশ্যে হলফনামা দেন যে ২০১৬-র মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে (অর্থাৎ ট্রাম্পের নির্বাচনে) যে বিদেশি শক্তি নাক গলিয়েছিল বলে মোটামুটি প্রমাণিত সেটা রাশিয়া নয়, ইউক্রেন। এই মর্মে ট্রাম্প আর যেলেন্সকির ফোনে কথাও হয়েছে এবং যেহেতু হোয়াইট হাউসে সব রকম সরকারি কাজকর্মের নথি মজুত রাখা হয়, এই বাক্যালাপের রেকর্ডিংও থাকার কথা।

হলে কী হবে, ট্রাম্প হাউসে-র তদন্তকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন, কোনো তথ্য-দলিল বা ফোনের কথোপকথনের টেপ কিছুই জমা দেননি, তাঁর অধীনস্থ কাউকে সাক্ষী হতেও দেননি। তাঁর দলও তথ্য, প্রমাণ, সাক্ষীসাবুদ ইত্যাদির পরোয়া না করে এই অভিযোগকে শুধুই বিরোধীদের চক্রান্ত, ট্রাম্পের প্রতি ডেমোক্র্যাটদের জাতক্রোধ বলে উড়িয়ে দিয়েছে। যে যাই বলুক না কেন, যত তথ্যই প্রকাশ্যে আসুক না কেন, রিপাবলিকানরা ট্রাম্পের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। টেলিভিশনের পরদায় দেখা যাচ্ছে সাক্ষীর পর সাক্ষী বলছেন, উচ্চপদস্থ সব সরকারি কর্মী, কেউ কেউ আবার ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বলেও পরিচিত, হ্যাঁ ডনাল্ড ট্রাম্প নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। রিপাবলিকানরা শুধু যে সত্যের অনুসন্ধানে নিরুৎসাহী তাই নয়, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে সাক্ষীদের হয়রানি করতে, অপদস্থ করতে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তকমা দিতে, মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করতে, নিদেনপক্ষে আহাম্মক প্রতিপন্ন করতে। কারণ এ কথা কেউ অস্বীকার করছে না যে কিছুদিনের জন্য ইউক্রেনের অনুদান সত্যিই আটকে ছিল। রিপাবলিকানদের বক্তব্য এ সব উপেক্ষা করাই শ্রেয়।

অতএব ট্রাম্প থোড়াই কেয়ার। বরং সগর্বে বুক ঠুকে বলেছেন যে, 'হোক ইম্পিচমেন্ট। এর ফলে আমাদের দল আরো সংঘবদ্ধ হয়ে গেছে।' সত্যিই তো, অভিযোগ যাই হোক না কেন, তা যতই যথার্থ হোক না কেন, ইম্পিচমেন্ট তো ফৌজদারি বা আইনি মামলা নয়, শেষ পর্যন্ত ইম্পিচমেন্ট একটা রাজনৈতিক লড়াই। তাই সেনেটে তারা হেরে যাবে জেনেও ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পকে ইম্পিচ করতে উদ্যত কারণ আগামী বছর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। ট্রাম্প আবার প্রার্থী হবেন সেটা প্রায় নিশ্চিত তাই জনগণের কাছে ট্রাম্পের ভাবমূর্তি কলুষিত করাই তাদের কাছে একটা বড়ো উদ্দেশ্য। ঠিকই, তারা এই আশাও করছে যে কিছু রিপাবলিকান তথ্য-প্রমাণের ভারে মত পালটাবে, তবে সে আশায় যে গুড়ে বালি তাও তাদের অজানা নয়।

কারণ রিপাবলিকানরা নিরুপায়। দেশের জন্য নয়, দশের জন্য নয়, সত্যের জন্য নয়, ন্যায়ের জন্য নয়, রাজনীতি করতে হলে ট্রাম্পকে তাদের চাইই চাই। না হলে টের পাবে ভোটের ময়দানে। কারণ তাদের ভোটার যে এখনও জবরদস্ত ট্রাম্প-ভক্ত। যে অভিবাসী বিরোধী, বিশ্বায়ন বিরোধী, বর্ণবিদ্বেষী, জাত্যাভিমানী বুলি আওড়ে ট্রাম্প মসনদে বসেছে তার বাজার এখনও রমরমা। বস্তুত বেড়েছে, কারণ এখন আর সংখ্যালঘুদের ঘৃণা করতে কোনো রাখঢাকের দরকার নেই, হিন্দি জানলে তাদের স্লোগান হত গর্ব সে কহো হাম শ্বেতাঙ্গ হায়।

রিপাবলিকানরা নাকি পরিবার কেন্দ্রিক। মহিলাদের সঙ্গে ট্রাম্পের ন্যক্কারজনক কীর্তিকলাপ নিয়ে কিন্তু কারও হেলদোল নেই। রিপাবলিকান দল চিরকালই মুক্ত বাজারের প্রবক্তা কিন্তু আমেরিকাকে ফের মহান বানাতে গিয়ে ট্রাম্প যে ধরনের আমদানি শুল্ক বসাচ্ছেন তাতে কারও আপত্তি নেই। রিপাবলিকানরা নাকি সর্বোচ্চ মূল্য দেয় আইনের শাসনকে। কিন্তু দু-একজন মাত্র রিপাবলিকান সাংসদ স্বীকার করেছেন, তবে মৃদুকণ্ঠে, যে ইউক্রেনের ব্যাপারটা ঠিক হয়নি কিন্তু তাঁরাও যে বিরুদ্ধে ভোট দেবেন এমন কথা ঘুণাক্ষরেও বলেননি। বলবেন কী করে। জনমত সমীক্ষায় দেখা গেছে ট্রাম্পের ভোটাররা, এবং তারা ট্রাম্পেরই ভোটার, রিপাবলিকান দলের

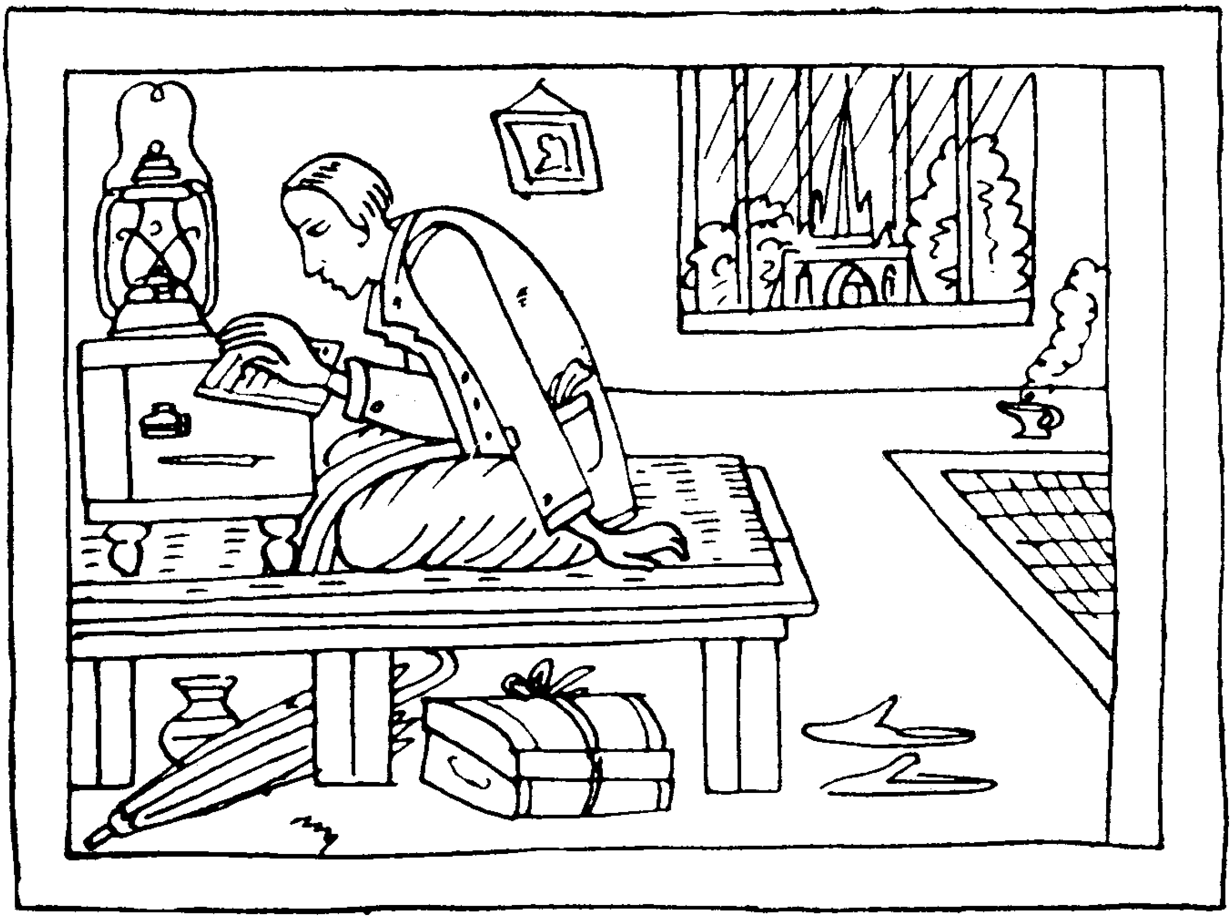

নয়, ইউক্রেনে তিনি কী করেছেন না করেছেন নিয়ে মোটেও ভাবিত নয়। বরং ভক্তরা ট্রাম্পের সঙ্গে একমত যে ডেমোক্র্যাটরা এ নিয়ে এত হইচই করছে যেনতেনপ্রকারেণ ট্রাম্পকে সরানোর জন্য।

এবার বুঝতে পেরেছেন তো কেন বলছি আমেরিকা ভারত হয়ে উঠছে? বা বোধহয় চিরকালই ছিল। আমরা জানতে পারছি ডনাল্ড ট্রাম্পের দৌলতে। সভ্যতার যে পালিশ, ভদ্রতার যে মুখোশ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতদিন এই সব ঢেকেঢুকে রাখত, ট্রাম্পের আমেরিকায় সে সব ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে। সোজা কথা সোজা করেই বলাই এখন রেওয়াজ, তা সে যতই ঘৃণ্য, যতই বিভেদজনক হোক না কেন। হায়দ্রাবাদ কাণ্ডের পর ভারতে যেমন।

বাবরি মসজিদ রায় প্রসঙ্গে

অশোককুমার গাঙ্গুলি

বাবরি মসজিদ নিয়ে আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন অনেক দিন ধরেই উঠছে। একদিকে হিন্দুত্ববাদীদের প্রবল হুমকি যে এই মসজিদ ধ্বংস করে এখানে রামের মন্দির আমরা তৈরি করব। অন্যদিকে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের আশা যে এই ধরনের হুমকি বাস্তবে রূপায়িত হবে না। বরং আদালত একটা সুবিচার করবেন, যেখানে বিবাদটা আদালতের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে এবং সর্বোচ্চ আদালতে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে পাঁচ বিচারপতি বসে এর ফয়সালা করছেন।

অনেক আশা-নিরাশার দোলাচলে থাকতে থাকতে আমরা দেখলাম ৯ নভেম্বর এই পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ প্রায় হাজার পাতার সংবলিত একটা রায় দিল। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই রায় পড়ে শুধু আমি নয়, যাঁরা ভারতবর্ষের সংবিধানের মূল ভাবটিতে বিশ্বাস করেন, তাঁরা হতাশ হয়েছেন। আমার ধারণায় ভারতবর্ষের সংবিধানে অনেক কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সেখানে মূল সূত্র তিনটি— গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র। একটিকে ছোটো করলে অন্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই সূত্রগুলি মাথায় রেখে এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট ও বিচারপতিদের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়ে যদি বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত সাম্প্রতিকতম রায় (M Siddiq vs Mahant Suresh Das & Others) আমরা পর্যালোচনা করি, তা হলে কতগুলি জিনিস কিন্তু আমি মেলাতে পারছি না।

প্রথমে বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত কয়েকটি বিন্দু আমরা আলোচনা করে নেব।

১। বর্তমান রায়ে বিচারপতিরা স্বীকার করেছেন বাবরি মসজিদ তৈরি হয়েছিল ১৫২৮ সালে। হয় বাবর তৈরি করেছিলেন অথবা তাঁর নির্দেশে হয়েছিল।

২। এই মসজিদ শূন্য জমিতে তৈরি হয়নি। এর তলায় কিছু কাঠামো ছিল, যেগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর। মসজিদ তৈরি হয়েছে ১৬ শতাব্দীতে। এই চার শতাব্দীর কোনো হদিশ আর্কিয়লজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এ.এস.আই)-এর প্রত্নতাত্ত্বিকেরা দিতে পারেননি।

৩। সুতরাং এটা বলার কোনো ভিত্তি নেই যে কোনো মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর যে কাঠামোর ধ্বংসস্তূপ পাওয়া গেছে সেটাকে মন্দির বলে চিহ্নিত করা যায় না।

৪। ১৮৫৬-৫৭ সালে এই মসজিদে কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। সেটা ঠেকানোর জন্য তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার সেখানে লোহার খাঁচা বা গ্রিল বসিয়ে দেয়। যার ফলে মসজিদ চত্বরে বিভাজন সৃষ্টি হয় এবং গ্রিলের বাইরে হিন্দুরা তাঁদের পুজো করেন, কিন্তু মসজিদের ভিতরে নামাজ পড়া চলতে থাকে। গ্রিলের বাইরে হিন্দুরা একটা চাতাল তৈরি করে সেটাকে রাম চবুতরা নাম দিয়ে তার পুজো করতে থাকেন।

৫। এই অবস্থা চলাকালীন ১৯.০১.১৮৮৫ তারিখে মহন্ত রঘুবীর দাস হিন্দুদের হয়ে একটা মামলা দাখিল করেন যে ওই চাতালে তাঁরা একটা মন্দির তৈরি করবেন এবং সেই মন্দির গড়তে যাতে কেউ বাধা না দেয়। ২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৫ সালে সেই মামলা খারিজ হয়ে যায় এই কারণে যে মসজিদের সন্নিকটে মন্দির তৈরি করলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে বিরূপ প্রভাব পড়বে।

৬। ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয় জেলা জজের উচ্চ আদালতে। কিন্তু উচ্চ আদালতও সেই আপিল খারিজ করে দেন ২৬ মার্চ ১৮৮৬ সালের রায়ে এই বলে যে ৩৫৮ বছর আগে মসজিদ তৈরি হয়েছে এবং সেই ঘটনাকে আজকে পালটে দেওয়া অসম্ভব।

৭। এই রায়ের বিরুদ্ধে Judicial Commissioner Oudh-এর কাছে দ্বিতীয় বার আপিল করা হয়। তিনিও মন্দির না গড়ার জেলা জজের রায় বহাল রাখেন এই যুক্তিতে যে ৩৫০ বছর আগে মসজিদ তৈরি হয়েছে।

৮। Judicial Commissioner Oudh-এর রায়ের বিরুদ্ধে হিন্দুপক্ষ তৎকালীন উচ্চতম আদালত Privy

Council-এ মামলা করেননি। সুতরাং Judicial Commissioner Oudh-এর রায়কেই আইনের ভাষায় এই বিরোধের শেষ কথা হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত।

৯। কিন্তু আদালতে বারবার পরাস্ত হয়েও হিন্দুরা থেমে থাকেননি। বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৩৪ সালে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগে এবং বাবরি মসজিদের কাঠামো কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার এই কাঠামো সারিয়ে দেন এবং আক্রমণকারী হিন্দুদের শাস্তিস্বরূপ জরিমানা করেন। এই ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে স্বাধীনোত্তর ভারত সরকারের থেকে অনেক বেশি সজাগ ছিল। এই সত্য পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হয়।

১০। এর পর বাবরি মসজিদের উপর হামলা হয় ১৯৪৯ সালের ২২ ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রে যখন হিন্দু দেবদেবীর বিগ্রহ চুপিসারে মসজিদ প্রাঙ্গণে রাখা হয়। এই ঘটনায় ওই অঞ্চলের পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর একটি এফ.আই.আর করেন যে মসজিদের ভিতরে মূর্তি স্থাপিত করে তাকে অপবিত্র করা হয়েছে। এই এফ.আই.আর-টি দাখিল করা হয় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ২৯৫, ৪৩৮ ধারায়। এবং নির্দেশ সত্ত্বেও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ওখান থেকে সরানো হয় না। এই ব্যাপারে ওয়াকফ কমিশনার একটি রিপোর্ট দেন। সেই রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হয় যে মসজিদের মধ্যে এইভাবে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি রাখার ঘটনা ছিল একটি সুপরিকল্পিত আক্রমণ। এই আক্রমণের আগাম আভাষ সত্ত্বেও সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি আক্রমণকে ঠেকানোর জন্য।

১১। এর পর ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে করসেবকদের উন্মত্ত জনতা মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

উপরোক্ত ঘটনাবলি বিবরণ আমি সুপ্রিম কোর্টের রায় থেকেই সংগ্রহ করেছি। অবশ্য ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালের সেই কালো দিন যখন বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হল তা আমরা টিভির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি। বর্তমান রায়ের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে যে জমির মালিকানা কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভিত্তি ও বিশ্বাসের উপর নির্ধারণ করা যাবে না। একথা বিচারপতিরা আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বিচারপতিরা এটাও বলেছেন যে ওই মসজিদে নামাজ পড়া হত এবং ওই মসজিদকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ কখনোই পরিত্যক্ত হিসেবে ঘোষণা করেননি। বাবরি মসজিদ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে একটা উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। এখন দেখা যাক ১৯৯২ সালে যখন সবার চোখের সামনে মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হল, তখন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার কী পদক্ষেপ নিল?

তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার একটি অধ্যাদেশ জারি করে ওই অঞ্চলটিকে অধিগ্রহণ করল। এই জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা করা হল। সেখানে সরকার রাষ্ট্রপতির জারি করা একটি রেফারেন্সও সুপ্রিম কোর্টে পাঠাল। সেই রেফারেন্সের বিচার্য বিষয় ছিল কোনো হিন্দু মন্দির বা হিন্দু ধর্মের সৌধ বাবরি মসজিদ তৈরি হওয়ার পূর্বে সেখানে অবস্থিত ছিল কি না।

ওই দুটি বিষয় বিচার করার জন্যে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতি একটি সাংবিধানিক বেঞ্চে বসলেন এবং সেই রায় Dr Ismail Farooqui & Others and Union of India and Others নামে খ্যাত। এই রায়ে বিচারপতিরা রাষ্ট্রপতি দ্বারা প্রেরিত কোনো রেফারেন্সের জবাব দেননি কারণ এই ব্যাপার নিয়ে নিম্ন আদালতে অনেক মামলা চলছিল। কিন্তু সরকারি জমি অধিগ্রহণকে মাননীয় তিন বিচারপতি বৈধ বললেন এবং অন্য দুই বিচারপতি অবৈধ বললেন কারণ ওই জমি অধিগ্রহণ সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে বৈধ বলার অন্যতম কারণ হিসেবে ওই তিন বিচারপতি বললেন যে মসজিদে নামাজ পড়া ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে আমি আমার Hindu Law and Constitution (Third edition, Eastern Law House) গ্রন্থের বিংশ পরিচ্ছেদে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের এই যুক্তি ধোপে টেকে না এবং সংবিধানে ধর্মাচরণের যে মৌলিক অধিকার আছে তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী (পৃ. ৩৬৬-৩৯৭)।

উপরোক্ত ঘটনা পরম্পরা থেকে কতগুলি বিষয় পরিষ্কার। ৪৫০-৫০০ বছর ধরে বাবরি মসজিদ রয়েছে যেটা কোনো মন্দির ভেঙে তৈরি হয়নি। ওই মসজিদকে হিন্দুরা বারবার আক্রমণ করেছে এবং অবশেষে বর্বরোচিতভাবে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভেঙে দিয়েছে যাকে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার একটি জাতীয় অপরাধ (national sin) বলে স্বীকার করেছে। মসজিদ ভাঙার জন্য ফৌজদারি মামলা হয়েছে। সেই মামলা চলাকালীন নিম্ন আদালতে যাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে একুশ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ফেরত নিয়ে নেয়। সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যখন সিবিআই যায়, সুপ্রিম কোর্ট State vs Kalyan Singh মামলার রায়ে বলেন যে প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ফৌজদারি মামলা চলবে কারণ

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা আমাদের দেশের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামোকে নাড়া দিয়েছে। তাঁরা বলেন যদিও এই ঘটনা পঁচিশ বছর আগে ঘটেছে কিন্তু দোষীদের সাজা হয়নি যার জন্য সিবিআই দায়ী। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেন যে মামলার প্রতিদিন শুনানি হবে লক্ষ্ণৌ-এর কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেন যে রায়বেরিলি থেকে মামলা সরিয়ে লক্ষ্ণৌ-এ নিয়ে গিয়ে তা দুবছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।

এইসব ঘটনা সত্ত্বেও বর্তমান আদালত নির্দেশ দেন যে যেই জমির উপর বাবরি মসজিদ দাঁড়িয়ে ছিল সেই জমি হিন্দুদের দিতে হবে কারণ হিন্দুধর্মের মানুষরা বিশ্বাস করেন ওইখানেই রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে একটা ট্রাস্ট গঠন করে তিন মাসের মধ্যে জমি হস্তান্তর করতে হবে।

বর্তমানের ১০০০ পাতার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট একবারও সংবিধানের ২৫ এবং ২৬ অনুচ্ছেদ নিয়ে (স্বাধীন ধর্মাচরণের মৌলিক অধিকার) কোনো আলোচনা করেননি। তদুপরি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দেননি। ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে। সেইদিন সংবিধান বলবৎ হওয়ার পর যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেখল যে বাবরি মসজিদ দণ্ডায়মান, তখন তাদের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার আছে মসজিদকে রক্ষণাবেক্ষণ করার। সংবিধান আসার পরেও বর্বরোচিত আক্রমণের দ্বারা এই মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার ফলে আইন অনুযায়ী যখন ফৌজদারি মামলা দাখিল হয়েছে তখন হিন্দুরা কীভাবে সেই জমির দখল নিতে পারেন? সুপ্রিম কোর্ট এইভাবে দখল নেওয়ার ভিত্তিকে মান্যতা দিয়ে বলতে পারেন না হিন্দুরা ওই জমিতে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে।

একটা অমীমাংসিত প্রশ্ন থেকে যায় যে বাবরি ধ্বংস হওয়ার পরে State vs Kalyan Singh মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে ফৌজদারি মামলা প্রতিটি আসামির বিরুদ্ধেই চলবে এবং প্রতিদিন শুনানির মাধ্যমে মামলা দুই বছরের মধ্যেই শেষ করতে হবে যেখানে আসামিরা প্রত্যেকেই হিন্দু এবং অনেকেই বর্তমান শাসক দলের প্রথম শ্রেণির নেতা। এই নির্দেশ রাষ্ট্রের উপর কার্যকর। এই নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অন্য একটি বেঞ্চ কী করে বলে ওই জমি হিন্দুদের ফেরত দিতে যেখানে মন্দির স্থাপন করা হবে? এইসব খটকা এবং প্রশ্ন আমার মনে উঠছে এবং সংবিধানের একজন ছাত্র এবং এক প্রাক্তন বিচারপতি হিসেবে আমি অত্যন্ত হতাশ হচ্ছি, মনে মনে বেদনাহত হচ্ছি। আমি এখনও আশা করি মৌলিক অধিকারের রক্ষক হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট আরো আশার আলো আমাদের দেখাবে।

যদি মসজিদ ভাঙা না হত

মালিনী ভট্টাচার্য

তাঁর সঙ্গে কোনো বিষয়ে মতৈক্য হবার প্রত্যাশা করিনি, তবে সুপ্রিম কোর্টের বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত রায় বেরোনোর পরে তাঁর এক লেখায় বিজেপি সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত যে বলেছেন ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বরের ঘটনা ছাড়া আজ ওই জমিতে রামমন্দির নির্মাণ সম্ভব হত না এই খুল্লমখুল্লা স্বীকৃতির সঙ্গে একমত না হয়ে পারছি না। কিন্তু প্রশ্ন, তবে কি এই সত্যও তিনি স্বীকার করতে রাজি আছেন যে তারও আগে ১৯৪৯ সালের ২২/২৩ ডিসেম্বর রাত্রে মসজিদের তালা ভেঙে হিন্দুমহাসভার প্রত্যক্ষ মদতে যদি কিছু ধর্মান্ধ দুর্বৃত্ত চোরের মতো ভিতরে ক'টি দেবমূর্তি বসিয়ে না যেত তবে ১৯৯২ সালে প্রকাশ্য দিবালোকে মসজিদ ভাঙাও সম্ভব হত না?

সর্বোচ্চ আদালতের রায় আমাদের এক দীর্ঘ ঘটনা পরম্পরার কথা মনে করাচ্ছে, যার সূত্র ধরে স্বপন দাশগুপ্তেরা বিজয়গর্বে বলছেন, আমাদের বিপক্ষ যখন কয়েক দশক ধরে বলে এসেছে বিষয়টির মীমাংসা আদালতের মাধ্যমেই হোক, তখন আজ তাদের আর মুখ খোলার এক্তিয়ার নেই। অথচ এই ঘটনা পরম্পরার দিকে স্পষ্টচোখে তাকালে বোঝা যায় যে সংসদীয় দল বিজেপির অগ্রগতির প্রধান সম্বল বারবারই ছিল সহমত নয়, পদে পদে আইন-সংবিধানের সঙ্গে মিথ্যাচার, শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টার বদলে জুলুমবাজি জারি রাখা। একমাত্র আদালতের চূড়ান্ত রায়ের মাধ্যমেই অযোধ্যা-বিতর্কে পূর্ণ দাঁড়ি টানা যেতে পারে, মানুষের এই আশা যদি সফল হয়ে না থাকে তা হলে তার কারণ এই ভয়ংকর অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি হবে না সেই নিশ্চিতি এ রায় আমাদের দিতে পারেনি। ধ্বস্ত মসজিদের ওপর মন্দির গড়ার অনুমোদন বরং এটা নিশ্চিত করল যে জুলুমবাজির পরম্পরাই চলবে। যাঁরা ভেবে আরাম পাচ্ছেন যে এই রায়ের ফলে এক লজ্জাজনক এবং অস্বস্তিকর অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল এবং এবারে আমরা নিশ্চিন্তে গণতান্ত্রিক রাজনীতির অন্যান্য প্রশ্নে ফিরে যেতে পারব, তাঁরা দিবাস্বপ্ন দেখছেন। আমরা নিঃশব্দে এ রায় মেনে নিলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে না।

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই রায়টির নির্যাস বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তার মূল প্রতিপাদ্যগুলি জনাবর্তে কিছুটা জানাজানি হয়েছে, বামপন্থীরা ছাড়া অন্য ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি তা নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য না করলেও অনেক বিশিষ্ট মানুষ সমালোচনা করেছেন এই রায়ের এবং দাবি জানিয়েছেন আদালত বিষয়টির পুনর্বিবেচনা করুক। কিছু সংখ্যালঘু ধর্মীয় সংগঠনও নতুন করে এর রিভিউ-এর জন্য আদালতে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আদালতের রায়, সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ-হওয়া আইন, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার সপক্ষে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সব রাজনৈতিক দলের দায়বদ্ধতা, এসব কিছুই যারা কোনোদিন মানেনি, মন্দির-মসজিদের রক্তাক্ত ইতিহাসে তাদের মূল ভূমিকার কথা এইজন্যই স্মরণ করা প্রয়োজন যে গণতান্ত্রিক মানুষ একে নিছক আইনের বিষয়, বা ধর্মীয় সমন্বয়ের বিষয় বলে ভাবতে অভ্যস্ত হলেও আসলে তা নয়, কোনোদিনই ছিল না; যখন থেকে হিন্দুমহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, বিশ্বহিন্দুপরিষদ এবং পরে তাদের রাজনৈতিক শাখা বিজেপি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে তখন থেকেই ধর্মবিশ্বাসকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার একরোখা উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্কের ভিত্তিটাই তারা পালটে দিয়েছে। এ রাজনীতির পালটা রাজনীতিই শুধু তাদের আপাত অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতিকে রুখতে পারে। আদালতের রায়ের রিভিউ হওয়া অবশ্যই উচিত, কিন্তু তার ফল অন্যরকম হলেই এদের দাপট কমবে এমন ভাবার কারণ নেই।

সর্বোচ্চ আদালতের চূড়ান্ত রায়ে একাধিকবার এসেছে ভারতের পরম্পরাগত সমন্বয়ী সংস্কৃতির কথা। কষ্টিপাথরের খোদাই-করা কিছু স্তম্ভের অলংকরণে যেমন হিন্দু সংস্কৃতির চিহ্ন পাওয়া গেছে তেমনই তিনটি গম্বুজ, ওজু করার স্থান, খোদিত আল্লার নাম, মিমবার, মেহরাব প্রভৃতি ভেঙে-ফেলা সৌধটিকে নিশ্চিতভাবেই মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছে, একথা বলার পরে তাঁরা এটাও বলেছেন যে পাশাপাশি দুই ধর্মের

সহিষ্ণু সহ-অবস্থান যেমন দীর্ঘদিন ধরে ঘটেছে, তেমনই কোনো কোনো পর্যায়ে বিরোধের ঘটনারও নজির রয়েছে (অনুচ্ছেদ ৭৬৯)। আমরা বলতে পারি, এই সমন্বয়ের নিদর্শন শুধু 'বিতর্কিত স্থলে'ই আছে তা নয়, পুরো অযোধ্যা-ফৈজাবাদ অঞ্চলেই তার বেশ কিছু অবশেষ এখনও পাওয়া যায়। বিগত আঠারো শতকে অযোধ্যায় যে সুফি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল, মন্দির-মসজিদ বিতর্কের মাঝে তা বিস্মৃত। আবার ধর্মীয় বিরোধের ইতিহাসও হিন্দু-মুসলিমের মধ্যেই শুধু ছিল তা নয় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রথম নথিভুক্ত নিদর্শনেরও আগে সেই আঠারো শতকেই অযোধ্যায় বৈষ্ণব রামানন্দী বৈরাগীদের সঙ্গে শৈব দশনামী সন্ন্যাসীদের জায়গা দখলের মারামারির কথাও ইতিহাসবিদরা আমাদের জানিয়েছেন, যার পরিণামে শেষোক্তরা অযোধ্যা থেকে উৎখাত হয়ে যায়।

১৮৫৫ সালের প্রথম হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা মসজিদ এলাকার বাইরে হনুমানগঢ়ীতে ঘটেছিল, তখন মসজিদ দখল হিন্দুদের উদ্দেশ্য ছিল এমন প্রমাণ নেই। তবে জানা যায়, ১৮৫৭ সালের সিপাহি অভ্যুত্থানের সময় হনুমানগঢ়ীর বৈষ্ণব মহন্তরা ইংরেজদের সহায়তা করায় অভ্যুত্থান শেষ হয়ে যাওয়ার পরে অযোধ্যা-ফৈজাবাদে নবাবদের সমস্ত জমিজমা যখন ইংরেজদের হাতে এল তখন সেই সহায়তার সুবাদে হনুমানগঢ়ীর জনৈক মহন্ত বাবরি মসজিদের বাইরের চত্বরের কিছু জমি হস্তগত করে সেখানে একটি চবুতরা তৈরি করে ফেলে; ঐতিহাসিক অযোধ্যাই কবিকল্পনার রামজন্মস্থান, এলাকায় বহুদিন প্রচলিত এ কাহিনিকে জিইয়ে তুলে রামানন্দীদের একটি অংশ প্রবল প্রচার ও নানা আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মনে নতুন বিশ্বাসের পত্তন করে যে রামের জন্মস্থান সেই প্রাসাদটি ছিল এই রামচবুতরাতেই। নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর জন্য এবং এ জমিতে দখলদারি কায়েম করার জন্য এটা তাদের পক্ষে জরুরি ছিল, যদিও অযোধ্যার অন্য দু-একটি জায়গাও আগে রামজন্মস্থান হিসাবে চিহ্নিত ছিল, কোথাও ভক্তেরা রামের নামে ছোটোখাটো মন্দিরও তৈরি করেছে, যার উল্লেখ রায়ে আছে (পৃ. ৪৯-৫০)। রামচবুতরার উত্থানের পর থেকে আস্তে আস্তে তাদের কথা সবাই ভুলে যায়।

মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারীরা সেই সময় থেকেই বারবার প্রতিবাদ করে এলেও চবুতরাটি কখনোই সরানো হয়নি, শুধু প্রশাসন শান্তিভঙ্গ ঠেকাতে তার পশ্চিমদিকে একটি লোহার রেলিং দিয়ে মসজিদের ভিতরের চত্বর থেকে রামচবুতরাকে আলাদা করে দেয়। রায়ে বলা হয়েছে, রেলিং তৈরি থেকেই অশান্তির সৃষ্টি। হিন্দুরা তাদের দীর্ঘদিনের প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় (অনুচ্ছেদ ৭৮১), কিন্তু কার্যত তার শুরু যে বাবরি-চত্বরে রামচবুতরা তৈরি থেকেই তার প্রমাণ রয়েছে। ১৮৮৫-তে 'জন্মস্থানে'র (চবুতরা) মহন্ত পরিচয়ে জনৈক রঘুবর দাস ওই জমির স্বত্ত্ব দাবি করে জন্মস্থানের উপযুক্ত একটি মন্দির ওই চবুতরায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য ফৈজাবাদের সাব-জজের কোর্টে এবং পরে উচ্চতর কোর্টে মামলা করে। দু-জায়গাতেই আবেদন নাকচ হয়ে যায়। এর পরে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই চত্বরে বড়ো দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর পাওয়া যায় না। ১৮৮৫-৮৬ সালের পরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ঝিমিয়ে পড়ার পর থেকে রামচবুতরাও আর তেমন কোনো গুরুত্ব পায়নি। রামজন্মস্থান যে বাইরের চবুতরায় নয়, মসজিদের অভ্যন্তরে এ দাবি উঠেছে আরো অনেক পরে।

১৯৩৪ সালে নিকটস্থ একটি গ্রামে গোহত্যার গুজবকে কেন্দ্র করে অযোধ্যায় আবার দাঙ্গা লাগে; বাবরি মসজিদের গম্বুজের একাংশ দাঙ্গাকারী কিছু হিন্দুর হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রশাসন তা সারানোর ব্যবস্থা করে, খরচের টাকা দাঙ্গাকারী 'বৈরাগী' এবং স্থানীয় হিন্দুদের জরিমানা করে তোলা হয়, একথাও সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা আছে (অনুচ্ছেদ ৬৯৯)। এতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল হনুমানগঢ়ীর বৈরাগীরা, কিন্তু হিন্দুমহাসভাও যে তখন নানাজায়গায় এ ধরনের ঘটনায় উশকানি দিচ্ছিল তার বহু প্রমাণ রয়েছে। তবে এই দাঙ্গায় হিন্দুমহাসভার ভূমিকা আনুমানিক হওয়ায় আমরা বলতে পারি এ পর্যন্ত এ পালার চালিকাশক্তি ছিল ধর্মান্ধ ও মারকুটে 'বৈরাগী'দের একাংশ, যাদের উদ্দেশ্য ছিল অযোধ্যায় নিজেদের ধর্মীয় প্রভাব তথা বিষয়আশয় ক্রমে বাড়িয়ে তোলা। হিন্দুমহাসভা যুক্ত থাকলেও তখনই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিজেদের বৃহত্তর রাজনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে তারা পারেনি।

কিন্তু ১৯৪৯-এর ঘটনার কুশীলবদের মধ্যে যে হিন্দুমহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং তাদের ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তি আড়ালে থেকে অথবা প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চালকের ভূমিকা নিয়েছিল তা আজ আর অজ্ঞাত নয়, যথা, সে রাত্রে যারা মসজিদে রামলালার মূর্তি বসিয়েছিল তাদের পাণ্ডা অভিরাম দাস নামে এক পালোয়ান সাধু, যে হিন্দুমহাসভার দ্বারা চালিত হত। মসজিদ থেকে রামলালার মূর্তি অপসারণের বিরুদ্ধে ১৯৫০-এর জানুয়ারিতে ইনজাংশনের আবেদন করে যে গোপাল সিং বিশারদ সে ছিল ফৈজাবাদে হিন্দুমহাসভার সাধারণ সচিব এবং অখিল ভারতীয় রামায়ণ মহাসভার যুগ্মসচিব। বস্তুত আদালতেও প্রভাব বিস্তার করে এই ইনজাংশন এবং উচ্চতর আদালতে তার অনুমোদন তারা পেয়ে যায়। আবার এইসব স্থানীয় নেতার পিছনে ছিল উত্তরপ্রদেশে হিন্দুমহাসভার সভাপতি দিগ্বিজয় নাথ যে গান্ধীহত্যার এক প্রধান আসামি ও বাবরি দখলের পরিকল্পনার মূলচক্রী এবং তার

দোস্ত ফৈজাবাদের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট কে কে নায়ার, যে ইনজাংশন জারির আগে পর্যন্ত নানা অজুহাতে এবং মিথ্যা রিপোর্ট দেখিয়ে মূর্তি অপসারণে বাধা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের গোবিন্দবল্লভ পন্থের নিষ্ক্রিয়তা এবং নেহরুকে ভুল বোঝানোর চেষ্টাও এই চক্রীদের পক্ষেই গিয়েছিল।

কৃষ্ণা ঝা এবং ধীরেন্দ্রকুমার ঝা নামে দুই সাংবাদিকের Ayodhya the Dark Night: the Secret History of Rama's Apperance in Babri Masjid (Harper Collins, 2012) নামক বইটিতে সমকালীন বহু নথিপত্র, আদালতের রেকর্ড, পত্রপত্রিকা এবং এই ঘটনার কয়েকজন কুশীলবের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে ১৯৪৯ সালের ২২/২৩ ডিসেম্বরকে ঘিরে কয়েকমাসের ঘটনা যা কালক্রমে ভারতের রাজনীতিকেই বদলে দিতে সাহায্য করেছিল। তথ্যপ্রমাণ দিয়ে তাঁরা দেখিয়েছেন, মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পরে আরএসএস ও তার সঙ্গে যুক্ত অন্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি জাতীয় রাজনীতিতে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল, এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাদের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা ছিল বিভিন্ন ধর্মান্ধ ব্যক্তি ও সংস্থা, প্রশাসনের শীর্ষে কিছু নীতিহীন লোক এবং কংগ্রেসের ভিতরের গুপ্ত বা ব্যক্ত হিন্দুত্ববাদীদের কোনো একটি ইস্যুর ভিত্তিতে এককাট্টা করে তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভাবকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলার।

আর রামজন্মস্থানকে তারা সেই ইস্যুতে পরিণত করতে সক্ষম হয়, যখন কয়েক মাসের প্রস্তুতির পর মসজিদের গম্বুজের ঠিক নীচে অভিরাম দাসের চোলাচামুণ্ডাদের দিয়ে রামলালার মূর্তি বসিয়ে মসজিদকে ব্যবহারের অযোগ্য করে মুসলিমদের সেইস্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হল। এরকম সময়েই বাইরের রামচবুতরা নয়, গম্বুজের নীচের অংশকে 'রামজন্মস্থান' বলে দাবি করা শুরু হয়। নেহরুর নির্দেশ রামলালার অপসারণ ঘটাতে ব্যর্থ হলেও আরএসএস-এর বৃহত্তর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, নেহরু কংগ্রেসের মধ্যে এবং জাতীয় রাজনীতিতে তাদের অগ্রগতি ঠেকাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু বলা চলে মসজিদের শুধু খোলসটিই অবশিষ্ট রইল যেদিন থেকে মুসলিমরা সেই স্থানে তাদের স্বাভাবিক ধর্মাচরণের অধিকার থেকে উৎখাত হল। রায় যাতে জোর দিয়েছে স্থানটির সেই 'অখণ্ডতা'ও সেদিন থেকে অর্থহীন হয়ে গেল।

হিন্দু মামলাকারীদের মধ্যে দুটি দলের ১৯৪৯ সালে চোরাগোপ্তা রামলালার মূর্তি মসজিদে ঢোকানোর সগর্ব স্বীকারোক্তি রায়ে নথিবদ্ধ আছে। বলা হয়, গান্ধীজির রামরাজ্যের স্বপ্নই এর প্রেরণা (পৃ. ৪৪৮-৪৪৯)। হিন্দুমহাসভার নিজস্ব বক্তব্য ছিল, স্বাধীন ভারতে আদি হিন্দু আইনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে, তাই তাদের কাজ আইনসংগত (৬০৭ অনুচ্ছেদ)। তৃতীয় দল নির্মোহী আখড়া আরেক ধাপ এগিয়ে বলেছিল, ওখানে মসজিদই নেই, থাকতে পারে না, অনাদিকাল থেকেই ওটা রামমন্দির, মুসলমানেরা ওটা দখল করে কিছু অদলবদল করেছিল মাত্র! সর্বোচ্চ আদালতের রায় তাদের মামলাকে নাকচ করলেও ওই জায়গায় হিন্দুদের পরম্পরাগত ধর্মীয় উপস্থিতির সওয়ালকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে।

এই ইতিহাস থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় ক্ষমতার লালসামত্ত আরএসএস বা হিন্দুমহাসভা ভক্তির নামে মানুষকে খেপিয়ে তোলায় কতটা দক্ষতা অর্জন করেছে। তারা তো জানে যে এটাই তাদের একটি প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার। তাদের ফ্যাসিস্ট চরিত্রেরই এটা পরিচয়। সুবিধামতো তারা আইন মানবে এবং আইনের রায় মতলবের বিরুদ্ধে গেলেই রাস্তায় নেমে দাঙ্গাহাঙ্গামা করবে বা আইন-প্রশাসনের মধ্যে অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে মতলব হাসিল করবে এটাও নতুন কথা নয়, নাগরিক নথিভুক্তিকরণের ফল তাদের পক্ষে না যাওয়ায় আসামে তা নতুন করে করা হবে বলে অমিত শাহের হুংকার আজ যে বার্তা নিয়ে আসছে, তার আদিপর্ব আমরা বাবরি মসজিদের পটভূমিতেই সংঘটিত হতে দেখেছি। অল্পদিন আগে আরএসএস-এর শীর্ষনেতা মোহন ভাগবত যখন সহসা আইনকে কুর্নিশ জানিয়ে প্রকাশ্যেই বাবরি-মামলায় আদালতের যে-কোনো রায় মেনে নেবার কথা বলেছিলেন তখন সেজন্যই কিছু বহুদর্শী ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে রায় কী হবে হয়তো তাঁদের অজানা নেই।

এই দলগুলির এই চরিত্র যেমন চল্লিশের দশকেই উন্মোচিত হয়েছে, তেমনই পরবর্তী সময়েও এর অনেক নজির ইতিহাসের পাতা থেকে এবং সর্বোচ্চ আদালত ১৯৫০-১৯৮৯ পর্যন্ত যে পাঁচটি মামলার ভিত্তিতে রায় দিলেন তার নথিপত্র থেকে দেওয়া যায়। ১৯৮৬ সালে মসজিদের ভিতরের অংশটির তালা খুলে দেওয়া হয় ফৈজাবাদের জেলাজজের আদেশে, এবং ওই বছর এবং ১৯৮৯ সালে বিতর্কিত স্থানে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টের দুটি নির্দেশ সত্ত্বেও এই সময়কালের মধ্যেই অযোধ্যায় রামশিলা নিয়ে করসেবকদের আনাগোনা শুরু এবং 'মন্দির ওয়হি বনায়েঙ্গে' জিগিরের উদ্ভব। এমনকী, রাজীব গান্ধীর আনুকূল্যে ১৯৯১-এর নভেম্বরে বিতর্কিত জমির ভিতরেই মন্দিরের প্রতিশ্রুত ভিত্তিস্থাপনও বাকি থাকে না। ওদিকে ১৯৯১ সালেই উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার ভক্তদের যাতায়াতের সুবিধা করার নামে নির্বিচারে বাবরি মসজিদের চারপাশে জমি অধিগ্রহণ করে সংকটমোচন মন্দির, লোমশ আশ্রম, গোপাল ভবন, সাক্ষীগোপাল মন্দির, ফলাহারী বাবার

আশ্রম প্রভৃতি বহু হিন্দু ধর্মস্থান ভেঙে ফেলে রাস্তা সাফ করতে লেগে যায়।

লক্ষণীয় যে এইসব কাজকর্ম যখন হিন্দুত্ববাদী দলগুলি উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের সাহায্যে করছে, তখনই আবার পার্লামেন্টের ভিতরে তারা নরসিমা রাওয়ের সরকারকে চাপ দিয়ে 'ধর্মস্থানে স্থিতাবস্থা'-র বিলটি থেকে 'রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ'-কে বাদ রাখার ব্যবস্থা করেছে। এটা ঠিকই যে এই সরকারও তাদের রেয়াত করার জন্য তৈরিই ছিল। তা ছাড়া যদি এটা বিলের অন্তর্ভুক্ত হত এবং তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও পাশ হয়ে যেত তবু আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মসজিদ ভাঙার আয়োজন চালিয়ে যেতে তারা একটুও দ্বিধা করত না। যেমন আজ বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে থাকা সত্ত্বেও এবং রায়ে 'ধর্মস্থানে স্থিতাবস্থা' আইনটির উল্লেখ থাকলেও আরএসএস-এর কর্তাব্যক্তিরা আইনের বিলকুল উলটোদিকে গিয়ে অক্লেশে বলছে, কাশীমথুরা বাকি রইল, কিন্তু সে শুধু এখনকার মতো।

এতবড়ো ছাড়টা পাওয়ার পরেও সেদিন তারা 'ধর্মস্থানে স্থিতাবস্থা' বিলের বিরোধিতা করেছিল কাশ্মীরকে তার আওতায় আনা হয়নি বলে এবং মূলত হিন্দুদের এতে 'ক্ষতি' হবে বলে। অর্থাৎ কী সংসদে, কী আদালতে, কী রাস্তায় তাদের নির্লজ্জ আগ্রাসনের রাজনীতি থেকে এক পা-ও পেছোতে রাজি ছিল না তারা, বরং এই নির্লজ্জতাই তাদের শক্তি জোগাচ্ছিল এবং হিন্দুত্বের আবেগকে ব্যবহার করে অন্য রাজনৈতিক দলের এবং প্রশাসনের একাংশকে প্রভাবিত করতে সাহায্য করছিল, বাকিরা যখন সংসদীয় বাধ্যবাধকতা মেনে চলার ফলে বা সুবিধাবাদের ফলে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আজও কিন্তু শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়টা বিরোধীদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েই আরএসএস সুপ্রিম কোর্টের রায় থেকে ফায়দা তুলছে।

সেদিন বিরোধীরা, বিশেষত বামপন্থীরা, এই বিল থেকে 'রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ'-কে বিশেষ ব্যাপার বলে ছাড় দিতে চায়নি, কিন্তু তার বিকল্প ছিল পুরো বিলটিই বানচাল হয়ে যাওয়া, কোনো ধর্মস্থানেরই আইনি সুরক্ষা না থাকা, যে দায়টা তখন বহন করতে হত তাদেরই। তারা তাই বলেছিল, বাবরির বিষয়টির সুরাহা করতে হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, না হলে আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে, কারণ সরকারিভাবে চাপিয়ে-দেওয়া আইনের চাইতে আদালতে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে ফয়সালা হলে এক্ষেত্রে তার মান্যতা বেশি হতে পারে (Loksabha Debates, Vol.5, nos. 41-49, p.448)।

তবে বামপন্থীদেরও আসল দুর্বলতা সম্ভবত এটাই ছিল যে শান্তি বিঘ্নিত হবার ভয় তাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল, আরএসএস-এর প্রচারযন্ত্রের পাশে খোলা রাস্তায় তাদের বিকল্প রাজনৈতিক প্রচার ছিল খুবই দুর্বল। অথচ এই ফ্যাসিস্ট দলটি তাদের আগ্রাসনকে সবরকম বিরোধিতামুক্ত করতে কতটা উদগ্র ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঠিক পরেই দিল্লিতে সফদর হাশমি মেমোরিয়াল ট্রাস্টের আয়োজিত 'হম সব অযুধ্যা' নামে অযোধ্যার প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে একটি ছোট্টো প্রদর্শনীর ওপর বজরং দলের হিংস্র হামলায়। কিছু কিছু বামপন্থীরও সেসময়ে মনে হয়েছিল, কী দরকার এভাবে ওদের উশকানি দেবার? এ মুহূর্তে ব্যাপারটাকে একটু থিতিয়ে যেতে দেওয়াই দরকার। বামপন্থীদের মধ্যেও যে সবাই তখনও হিন্দুত্ববাদী শক্তির আসল পরিচয় পাননি এটা তারই উদাহরণ।

১৯৯২ সালে মসজিদ ভাঙার অল্প ক'দিন আগেও খোদ আদবানি লোকসভায় দাঁড়িয়ে সবাইকে এই নিশ্চিতি দিয়েছিলেন যে করসেবকেরা রামলালার পুজো করেই অযোধ্যা থেকে বিদায় নেবে, এটাই শান্তিরক্ষার সেরা উপায়। এবং ঘটনার দিন পাঁচ ঘণ্টা ধরে সেই প্রলয়কাণ্ড সহর্ষে দেখার পরে দিল্লি ফিরে বলেছিলেন, ওদের আবেগ এমন চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছেছিল যে ওদের ঠেকানো যায়নি। অন্যদিকে সেই পাঁচ ঘণ্টা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ধ্বংসের পরেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নরসিমা রাওকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন করসেবকেরা মন্দির ভাঙার পরে ধ্বংসস্তূপের ওপর ত্রিপল টাঙিয়ে যে মূর্তিগুলি বসিয়ে দিয়ে গেছে সেগুলি অবিলম্বে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে; নরসিমা রাও সেকথায় কর্ণপাত করেননি। নিজেরা তখনও শাসনক্ষমতায় না থাকলেও ১৯৪৯-এর ধাঁচেই আরএসএস ঠিক খুঁজে বার করেছিল প্রশাসনের শীর্ষের সেই ব্যক্তিকে যিনি তাদের কার্যোদ্ধারে সাহায্য করতে কার্পণ্য করবেন না। ১৯৪৯-এর ফল এইভাবেই ১৯৯২-তে এসে ফলাতে পারল তারা।

প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয়টি হত না, আবার মসজিদটি আজ থাকলে মন্দির-গড়ার রায়ও মিলত না। তবু আইনে অনপড় ব্যক্তিরও মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে যে, এ মামলায় 'জমি কার'? এটাই তো ছিল প্রশ্ন, যে প্রশ্নটির উত্তর দেবার জন্য মুসলিমদের প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণের অনেকটাই মসজিদের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে। তবু জমির মালিকানার প্রশ্নের বাইরে গিয়ে কেন মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত সে জমিতে মন্দিরই হবে এবং হলে তা কীভাবে হবে সেই নির্দেশ দিতে গেলেন? এইজন্যই এমন ব্যক্তিরও মনে ধন্দ থেকে যায় রায়ের সঙ্গে সংযুক্ত অস্বাক্ষরিত হলেও পাঁচজনের একজন (?) বিচারপতিরই তৈরি করা ১১৬ পাতার পরিশিষ্টটি নিয়ে। ধন্দ থাকে, কারণ আমরা বুঝতে পারি না 'হিন্দু বিশ্বাস ও সংস্কার' বলতে কী বোঝায় তাই নিয়ে এই দীর্ঘ বয়ান কিসের জন্য?

পুরাণগুলির মধ্যে অর্বাচীন (সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দী) 'স্কন্দ

পুরাণ' এবং হিন্দু ধর্মগুরুদের মৌখিক মতামত বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করে এই পরিশিষ্ট সিদ্ধান্ত করেছে যে মসজিদ তৈরির অনেক আগে থেকেই বাবরি মসজিদের জায়গাটি ছিল হিন্দু বিশ্বাসে 'রামজন্মস্থান' হিসাবে স্বীকৃত এবং সেখানে লাগাতার রামের পূজার এক পরম্পরা ছিল। বস্তুত রায়ের মধ্যেই একথা বারবার এসেছে যে ১৮৫৭ সালে প্রশাসনের তোলা রেলিংই প্রথম হিন্দুদের 'গর্ভগৃহে' প্রবেশের পুরোনো অধিকারকে বিঘ্নিত করে। কিন্তু যেখানে মসজিদ বর্তমান রয়েছে সেখানে হিন্দুরা কী করে ভিতরে ঢুকে গম্বুজের নীচে পুজোআচ্চা চালাত এটা সহজবুদ্ধিতে আমরা বুঝতে পারি না। বরং ১৯৪৯ সালে মসজিদকে মূর্তিস্থাপনের মাধ্যমে অপবিত্র করে ভিতর থেকে যখন কার্যত মুসলিমদের তাড়ানো হল, এবং ইনজাংকশন এনে সেই মূর্তির স্থায়িত্ব ও নিত্যপূজার ব্যবস্থা করা হল, হিন্দুদের মসজিদের ভিতর আনাগোনা তার পর থেকেই, এই বয়ানটিই তো গ্রহণযোগ্য মনে হয়। ১৯৮৬-তে তালা খোলা হল ভক্তসাধারণের জন্য, কিন্তু মুসলিমরা আর প্রবেশাধিকার পেলেন না।

মসজিদ ভাঙার পর ১৯৯৩ সালের জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় সরকার বিতর্কিত এলাকার জমি অধিগ্রহণ করে নেয়। আশ্চর্যের বিষয়, এই সময়ে আচম্বিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের কাছে পরামর্শ চান, মসজিদের জমিতে পূর্বে হিন্দু মন্দির থাকার সম্ভাবনা আছে কি না তাই নিয়ে। পাঁচজন বিচারপতির বেঞ্চ সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু তবু থামেনি হিন্দুত্ববাদীরা। একদা আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের অন্যতম শীর্ষ প্রত্নতত্ত্ববিদ বি. বি. লাল আদবানির রথযাত্রার সময়ে আরএসএস-এর 'মন্থন' পত্রিকায় প্রথম জানান মসজিদের জমির নীচে প্রাপ্ত স্তম্ভাবলির কথা যা তাঁর খননের কোনো রিপোর্টেই আগে ছিল না। এরই ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের আগেকার রায় অগ্রাহ্য করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ২০০২ সালে আদেশ দেয় ওই ধ্বস্ত জমির তলায় কোনো হিন্দু ধাঁচার অবশেষ আছে কি না এবং মসজিদ তৈরি করতে তা ভাঙা পড়ার প্রমাণ আছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য খননকার্য চালাতে।

'হিন্দু বিশ্বাস' প্রমাণ করার এই প্রতিটি ধাপেই অনুমান করা যায় কোথাও সরাসরি, কোথাও পরোক্ষভাবে গরিষ্ঠবাদী চিন্তার প্রভাবের কালোছায়া দীর্ঘায়িত হয়েছে শুধু জনমানসের ওপর নয়, সংসদ সরকার আদালত সংবিধানের এই তিনটি আধারশিলার উচ্চস্তর পর্যন্ত। বি. বি. লালের স্তম্ভ-কাহিনির প্রতিবাদে আর এস শর্মা, সুরজ ভান, আথার আলি ও ডি এন ঝা— এই চারজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ যে রিপোর্টটি লিখেছিলেন এলাহাবাদ আদালতের বিচারপতি সুধীর আগরওয়াল তা শুধু নস্যাৎই করেননি, তাঁদের দক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন। শীর্ষ আদালত এই মন্তব্যকে 'অতিরিক্ত কঠোর' বলে মনে করলেও সিদ্ধান্ত করেন ইতিহাসবিদরা কেউ বি. বি. লালের খননের জায়গা চোখে দেখেননি, হাইকোর্টের রায়ে পরে যে খনন হল তার রিপোর্টও তাঁদের হাতে ছিল না (৫৯৫ অনুচ্ছেদ)। তাঁরা তাই আরএসএস শর্মাদের রিপোর্টকে পাশে সরিয়ে আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের ২০০৩-এর রিপোর্টকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তা বাতিল করার কোনো কারণ দেখেননি, যদিও এই শেষ রিপোর্ট থেকেও এইটুকুর বেশি পাওয়া যায়নি যে মসজিদের ধাঁচা দাঁড়িয়েছিল তলার অন্য একটি সৌধের দেওয়ালের ওপর যা আনুমানিক ১২ শতাব্দীর এবং যাতে 'হিন্দু সৌধের লক্ষণ আছে' (৭৮৮ অনুচ্ছেদ) তা ধ্বংস করে মসজিদ হয়েছিল এমনও প্রমাণ ছিল না। এ আবিষ্কার 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' হলেও কিন্তু রায় রচনাতে অধিকন্তুর ভূমিকা পালন করেছে।

এই শেষ উৎখনন নিয়েও অনেক বিশেষজ্ঞের আপত্তি আদালতের সামনে ছিল। ডি মণ্ডল এবং শিরিন রত্নাগর এই দুই অগ্রণী প্রত্নতত্ত্ববিদকে আদালত অনুমতি দিয়েছিল উৎখননের জায়গায় উপস্থিত থাকার। তাঁরা এই উৎখননের পদ্ধতি এবং উৎখননে প্রাপ্ত জিনিষগুলির সংরক্ষণের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন, যেমন তাঁরা অভিযোগ করেন কিছু পালিশ-করা সামগ্রী এবং পশুর হাড় বিলকুল গায়েব হয়ে যাবার, যা কোনো বৈষ্ণব মন্দির তলায় থাকার বিষয়টিকে অপ্রমাণই করত (Archaeology after Excavation, 2007)। তা ছাড়া ডি মণ্ডল ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম বই Archaeology after Demolition-এ বি. বি. লালের উৎখনন পদ্ধতির যথাযথতাকে মেনেও তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন, বলেছিলেন স্তম্ভের নিম্নদেশ যেগুলিকে বলা হচ্ছে তার সবকটি একই প্রত্নস্তরে নেই, তা ছাড়াও দেখা যাচ্ছে তা পাথরের নয়, ভাঙাচোরা ইটের তৈরি। তা হলে এক বিশাল হিন্দুমন্দিরের ছাদকে তা ধরেছিল, কী করে একথা বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি। আর ভাঙার সময় মসজিদচত্বর থেকে করসেবকেরা যেসব জিনিস নাকি কুড়িয়ে পেয়েছিল, প্রত্নবস্তুহিসাবে সেগুলির মান্যতা তো কানাকড়িও নয়। এই সবকিছু সত্ত্বেও কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিব্রাজক টীফেনথ্যালারের ভ্রমণকাহিনি এবং অন্যান্য জনশ্রুতিভিত্তিক নথি ও মৌখিক সাক্ষ্যের পাশাপাশিই বিতর্কিত উৎখননের রিপোর্ট শীর্ষ আদালতের রায়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বাবরির ভিতরে-বাইরে হিন্দুদের উপস্থিতি এবং স্থায়ী পরম্পরার প্রমাণ মুসলিম উপস্থিতির প্রমাণের তুলনায় জোরদার তাঁদের এ যুক্তির ভিত্তি যে এর চেয়ে খুব বেশি নয়, আইনজ্ঞ না হয়েও এটুকু হয়তো বলা যায়।

মসজিদ না ভাঙলে মন্দির-গড়ার রায় মিলত না। মন্দির-

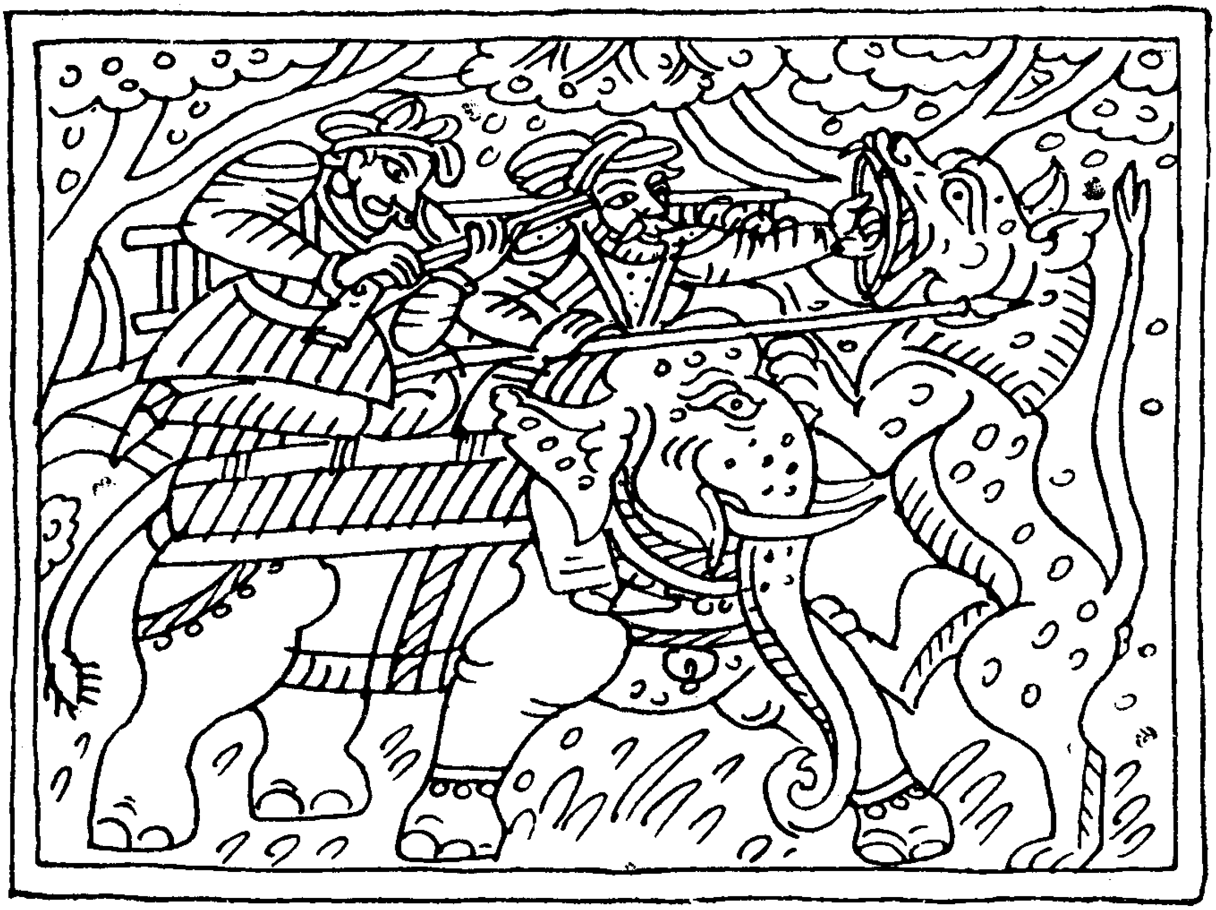

গড়ার রায় না মিললে বিজেপির অখণ্ড প্রতাপের কাহিনি একটু টাল খেত, যেটা তাদের সহ্য হয় না বলেই এত আয়োজন। সেখানেই তাদের দুর্বলতাও। তাই তো আরো বেশি প্রয়োজন সোচ্চার বিরোধিতার। শীর্ষ আদালত বারবার বলেছেন তথ্যপ্রমাণকে তার প্রাসঙ্গিকতায় দেখতে হবে। কোনো তথ্যপ্রমাণই আচোট অক্ষত হতে পারে না। যে বিশেষ মুহূর্তে তার উদ্ভব বা পুনরাবিষ্কার তার মধ্যেকার বিশ্বাস সংস্কার এবং রাজনীতি তার মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে। বিচারকে তার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে এটাই তাঁদের মত। কিন্তু তাঁদের রায় সমকালীন রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকতে পারল কি? আরএসএস-বিজেপি তাদের নিজস্ব রাজনীতিকে নির্লজ্জভাবেই জারি রেখেছে। এবং তারা এটা করছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখল করে মানুষকে সন্ত্রস্ত জড়ভরতে পরিণত করার জন্য। তাই বাবরি-ধ্বংস মুসলিমদের বিরুদ্ধে যতটা তার চেয়েও বেশি মানব-সভ্যতার বিরুদ্ধেই অপরাধ। রুজিরুটির আসল রাজনৈতিক লড়াই লড়তে হলে এই অপরাধকে অতীতের বিষয় বলে কি সরিয়ে রাখা যাবে? আমাদের চিন্তাভাবনাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার ফ্যাসিস্ট রাজনীতি— বিজেপির রাজনীতি— তো তাই চায়। সেই মোহজাল ছিন্ন না করলে, এই অপরাধকে সুস্পষ্ট ধিক্কার না জানালে এর বিরুদ্ধে রাজনীতির লড়াই অসম্ভব।

অযোধ্যা: যাক ছিঁড়ে মিথ্যার জাল

আশীষ লাহিড়ী

বাবরি মসজিদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বহু-বিলম্বিত, বহু-প্রতীক্ষিত এবং বহু-প্রত্যাশিত এই রায়ের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার রাস্তা প্রশস্ত হল আর সেই সঙ্গে হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের দিকে একটা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করা হল।

এদেশের গণতন্ত্রে সবকিছু ভাঙাচোরা হলেও আইনব্যবস্থাটার ওপর অনেকের তবু একটু ভরসা ছিল, যে এখানে হয়তো কিছু বুদ্ধিমান ও একইসঙ্গে বিবেকবান লোকজন আছেন; কিন্তু দেখা গেল তাঁরা আণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘুতা নামক রোগে আক্রান্ত। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা একটি বিসংবাদহীন, 'সর্বসম্মত' (এই কথাটার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে) রায়ে যেসব যুক্তি দিয়েছেন, আইন-অবিশেষজ্ঞদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তার তল পাওয়া ভার। হিন্দুরা মনে করে এটা রামের জন্মভূমি এবং এই ধরনের বিশ্বাসী হিন্দুর সংখ্যা অনেক— এই কথাটা সুপ্রিম কোর্টের জজসাহেবদের কাছে যথেষ্ট গ্রাহ্য একটা যুক্তি। আইনের কাছে বিশ্বাসটা আদৌ কী করে যুক্তি বলে মনে হতে পারে? আইন-বিশেষজ্ঞ অশোক গাঙ্গুলিমশাই একটা টেকনিকাল কথা বলেছেন যা আইন-অবিশেষজ্ঞদের মাথায় আসত না। সেটা এই যে, সংবিধানে বলা আছে, যে-স্থানে বেশ কিছুদিন ধরে নামাজ পড়া হয় সেটাকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বাবরি মসজিদে যে দীর্ঘদিন নামাজ পড়া হয়েছে, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। এবার, আমাদের সংবিধান সরকারিভাবে গৃহীত হয়েছে ১৯৫০ সালে। সুতরাং, সংবিধান অনুযায়ী ওই স্থানটিকে আমরা মসজিদ বলে গ্রাহ্য করতে বাধ্য। সংবিধান গৃহীত হবার আগে ওখানে কী ছিল, সে-বিচারের এক্তিয়ারই বিচারপতিদের নেই। পাঁচশো বছর আগে ওখানে কী ছিল, তার ভিত্তিতে ওখানে মন্দির ছিল নাকি মসজিদ, কাঠামোর তলায় কী ছিল, এই প্রশ্নটা এখানে একেবারেই প্রাসঙ্গিক নয়। অশোকবাবুর মতে কোর্টের এই বিচার সরাসরিভাবে ধর্মস্থানের সংবিধান স্বীকৃত সংজ্ঞার বিরুদ্ধে গেল।

শীর্ষ আদালত নাকি আর্কিয়লজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্টের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর্কিয়লজিকাল সার্ভে বলেছে, বাবরি মসজিদের তলায় নাকি একটি 'অন্-ইসলামিক স্থাপত্য'-র কাঠামো পাওয়া গেছে। অন্-ইসলামিক স্থাপত্য মানেটা কী? তা কোনো মন্দিরও হতে পারে, বৌদ্ধস্তূপও হতে পারে, অন্য যে-কোনো কিছু হতে পারে। আদৌ কোনো ধর্মস্থান না-ও হতে পারে। তা হলে কী করে এই অমীমাংসিত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বিচারপতিরা ওখানে একটি হিন্দু মন্দির স্থাপনের রায়টি দিলেন? বিশ্বাসে মিলয়ে মন্দির? আদালতও তাই বিশ্বাস করে?

একটা কাল্পনিক প্রশ্ন তুলতে ইচ্ছে করছে। ধরা যাক, কোনো মন্দিরের নীচে বৌদ্ধ স্তূপ ছিল বলে বৌদ্ধরা দাবি করলেন; তাঁরা যদি সংখ্যায় 'অনেক' হন, তা হলে মন্দির ভেঙে স্তূপ বানানো চলবে তো! অনেক মানে কত?

আর যদি ইতিহাসের প্রসঙ্গই ওঠে, সেখানেও পরিস্থিতি অতি বিচিত্র। অনেক আগে রোমিলা থাপারের তোলা আরেকটি প্রশ্নর খেই ধরে আমরা প্রশ্ন করতে পারি: বিচারকরা ইতিহাসের প্রসঙ্গ তুলছেন, অথচ ইতিহাসের খুঁটিনাটির মধ্যে যাচ্ছেন না, কেবল আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভের দেওয়া একটি প্রতিবেদনের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখছেন; এদিকে পাঁচশো বছর আগে ওখানে কী ঘটেছিল, তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, এটা কী ধরনের সোনার পাথরবাটি?

যাঁরা এই রায় দিয়েছেন, তাঁরা কেউ নির্বোধ লোক নন, তাঁরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট পড়াশোনা-জানা মানুষ, বুদ্ধিমান মানুষ। তাই যখন তাঁরা জেনেশুনে যুক্তির ধোপে টেকে না এমন একটা রায় দেন, তখন বুঝতে হবে তাঁদের অন্য কোনো বাধ্যবাধকতা আছে। এবং তা খুব পরিষ্কারভাবেই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা। এই রায়ের পর প্রধানমন্ত্রী এরকম একটা কথা বলেছেন যে এবার এক সোনালি যুগের সূচনা হল ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ ওঁরা জানিয়ে দিলেন, জজসাহেবদের রায়টা ওঁদের অনুকূলে গেল।

অবশ্য অনেকে বলছেন, কেন, এই ব্যবস্থাটা তো বেশ ভালোই হল, মন্দিরও হল, আবার মসজিদ করারও একটা

ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। টিকিও ভালো, নুরও ভালো। এটা কিন্তু সুবিধাবাদী কথা। কেননা প্রশ্নটা ছিল টাইট্‌ল ডিড-এর। সেই টাইট্‌ল ডিড-এর মীমাংসাটা কিন্তু হল না। যে ভিত্তিতে মীমাংসার কথা বলা হল তা আইনের দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য নয়, ইতিহাসের দিক থেকেও নয়। আর তার থেকেও বড়ো কথা, এই মামলাটা আদপে উঠেছিল কেন? মামলা উঠেছিল তার কারণ বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছিল। সেটা যে আইনের দিক থেকে একটা অপরাধ হয়েছিল, তা মানতে তো কারও দ্বিধা নেই। যে-অপরাধের ভিত্তিতে মামলাটা উঠে এল সেই অপরাধটার কোনো ন্যায়বিচার হল না, কিন্তু আমি সেই বিষয় সংক্রান্ত একটি রায় দিয়ে দিলাম, এটাই বা কেমন আশ্চর্য কথা!

অনেকে বলছেন রায়টি হাস্যকর। তা কিন্তু নয়। বরং এটি চূড়ান্ত সিনিকাল একটি ঘটনা। এটা পুরোপুরি জেনেবুঝে ঘটানো হয়েছে। হয়তো এই হাজার পাতার রায়ে কী লেখা হবে তা অনেক আগে থেকেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা এখন আমাদের দেশকে শাসন করছেন, তাঁদের মূল অ্যাজেন্ডা হল শেষপর্যন্ত এ দেশে একটা হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। সেটা তো রাতারাতি হবে না, তার জন্য একটা একটা করে ধাপ অতিক্রম করতে হবে। একটা ধাপ আজকে এগোনো গেল। পাঁচশো বছরের পুরোনো মসজিদ ভেঙে দিয়ে সেখানে একটা হিন্দু মন্দির তুলে দেওয়া গেল। দেখিয়ে দেওয়া গেল, এটা করা যায়। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর দক্ষিণপন্থী, ধর্মীয় আধিপত্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী একদল গুন্ডার বাহিনী যে অপকর্মটি করেছিল, ২০১৯-এর ৯ নভেম্বরে রাষ্ট্র স্বয়ং তাকে মান্যতা দিল।

এই প্রসঙ্গে আমার এক বন্ধু, প্রবীর মুখোপাধ্যায়, যিনি আইনের খুঁটিনাটি অনেক ভালো জানেন, বললেন, এই রায়ে এমন কথা কোথাও বলা নেই যে রায়টিকে 'প্রিসিডেন্স' (নজির) হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ এই রায় ভবিষ্যতে আরো এই ধরনের অনেক কাণ্ড করার জমি তৈরি করে রেখে দিল। অমুক অমুক স্থাপত্যের নীচে হিন্দু মন্দির আছে, অতএব সেগুলো ভেঙে মন্দির বানিয়ে দিতে হবে, এ দাবি ওঠা সময়ের অপেক্ষা। হয়তো তাজমহলের কথাও উঠবে। সত্যিই তো, এখনকার বহু স্ট্রাকচারের তলায় অন্য কিছু আছে, এখন রাম মন্দিরকে প্রিসিডেন্স ধরে নিয়ে যদি এগোনো যায়, তা হলে এর শেষটা কোথায়?

পাশাপাশি এতে আরো যেটা হল, মানুষকে এই দিকটা নিয়ে একটু ব্যস্ত রেখে দেওয়া গেল, ফলে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অন্য নানা সমস্যা কিছুটা আড়ালে চলে গেল। যেমন পেঁয়াজের দাম একশো টাকা, আলুর দাম পঁচিশ টাকা, গোটা অর্থব্যবস্থায় কার্যত মন্দার ঢল নেমেছে; নতুন চাকরি, নতুন কাজ সৃষ্টি হওয়া দূরস্থান, পুরোনো চাকরিই থাকছে না; এরকম দিনের পর দিন চলছে, অথচ এই নিয়ে কোনো আন্দোলন নেই। আগে মূল্যবৃদ্ধি হলে লোকে রাস্তায় নামত, কৈফিয়ত চাইত, যে কেন এমনটা হল। মনে আছে, ঘনঘন মিছিলের ঠেলায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠত শহরবাসী, কিন্তু এখন শান্তি, শ্মশানের শান্তি। যাদের পকেট ভরতি, তারা শাহরুখ আর বিশালে ফুর্তিমগ্ন; বাকিরা ভাবছে, নাই-বা পেলাম খেতে, মুসলিমগুলোকে তো বাগে আনা গেছে। আসলে ধর্মীয় বিভাজনের ব্যাপারটা, আমরা-ওরা-র ব্যাপারটা; এটা আমাদের, ওটা ওদের; এটা হিন্দুদের সমস্যা, ওটা মুসলমানদের; এগুলো এত বেশি করে মানুষের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া গেছে, যে আসল সমস্যাগুলো মানুষকে আর সেভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পারছে না।

আর এই সুযোগে দেশটাকে কার্যত বেচে দেওয়া হচ্ছে। দেশের সম্পদ, দেশীয় সংস্থাগুলোকে বহুজাতিক কিংবা একজাতিক কোম্পানির কাছে প্রায় জলের দরে বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এক্ষেত্রে একজন দক্ষ সেলসম্যানের কাজ করছেন। অমুক জায়গায় একটা জব্বর দাঁও পাওয়া গেছে, তিনি সেটার খবর পৌঁছে দিলেন একটা ভালো কোম্পানির কাছে, কোম্পানিটি অত্যন্ত কম দামে তা পেয়ে গেল। কার্যত বিনা প্রতিরোধে এগুলো হয়ে চলেছে। শাসক যে মাখনের মধ্যে ছুরি চালানোর মতো করে তাদের সমস্ত লক্ষ্য পূর্ণ করে চলেছে সেটাই একটা দেখবার মতো জিনিস। ধর্ম ধর্ম করে মানুষের মনকে এত আহিত (চার্জড) করে রাখা হয়েছে যে মানুষ ভাবছে, কোনটা মন্দির কোনটা মসজিদ এটাই বুঝি তার মরণবাঁচন সমস্যা, অথচ আসল মরণবাঁচনের সমস্যাগুলির দিকে তাকাচ্ছে না, অন্তত যতটা গুরুত্বের সঙ্গে তাকানো দরকার, ততটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। অতএব, সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পেছনে সুদূরপ্রসারী কুশলী চাল রয়েছে। বিচারব্যবস্থাকে যেভাবে কুক্ষিগত করা গেল, তাতে বলতে দ্বিধা নেই, একটি মনোলিথিক ফ্যাসিস্ট হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ।

বিজ্ঞানলেখক অশোক মুখোপাধ্যায় খুব সুন্দর বলেছেন: 'হিন্দুত্ববাদী প্রোমোটাররা মন্দির নির্মাণের জন্য জমি এবং অনুমতি পেলেও যে প্রক্রিয়ায় এই জমি তারা দখল নিতে পারল, তাকে জনগণের সামনে আদালতের ছাপ লাগিয়ে বৈধ করে তুলতে পারল না। শেষপর্যন্ত এর মধ্যে গায়ের জোরের ছাপ্পাটা লেগেই গেল, এবং অশোকস্তম্ভ শোভিত এই ছাপ্পাটা এল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের দিক থেকেই। ফলে একে বামপন্থীদের চক্রান্ত, সেকুমাকুদের চাপ, ইত্যাদি বলার সুযোগ আর রইল না।' (https://4numberplatform.com/?p=16152)

বাজারে একটা মধ্যপন্থী মতও শোনা যাচ্ছে, সেটা এইরকম: 'পেঁয়াজ আর আলুর দাম এমন কিছু মরণবাঁচন সমস্যা নয়।

কর্পোরেটাইজেশনের ঝোঁক এবং পরিবেশের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা হল মরণবাঁচন সমস্যা। সেগুলো থেকে সরকার চোখ ঘোরাতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেশের শীর্ষ আদালত সম্পর্কে এমন চরম অবমাননাকর সিদ্ধান্তে পৌঁছনোটা কি আদৌ সঠিক? ভারতে গণতন্ত্র মোটেও খুব ভাঙাচোরা বা নড়বড়ে নয়। বরং আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় আমরা অনেক বেশি মুক্ত চিন্তার অবকাশ পেয়ে থাকি, এটা নেহাত কূপমণ্ডূকরা ছাড়া সবাই স্বীকার করবে। সুপ্রিম কোর্ট সম্পর্কে এরকম চটজলদি সিদ্ধান্তে পৌঁছে, এবং সে কথা এভাবে জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়ার অর্থ, 'আমাদের সেই গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ভেতর থেকে নষ্ট' করা। 'এভাবে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করে নিজেদের সর্বনাশ' ডেকে আনা অনুচিত।

(https://4numberplatform.com/?p=16127) কিন্তু যেসব কারণে 'আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় আমরা অনেক বেশি মুক্ত চিন্তার অবকাশ পেয়ে থাকি', আঘাতটা তো এসে পড়ছে ঠিক সেই জায়গাটাতেই। আঘাত সম্বন্ধে সংবেদনহীনতা অনেক বড়ো অসুখের লক্ষণ, তা এক দুরারোগ্য ব্যাধি।

অপরদিকে, যুক্তিবাদী তরুণ সম্প্রদায়ের মত হল: 'এর শেষ ও সুদূর পরিণতি হয়তো ভালোই হবে। অ-ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির শেকড় পুরো উপড়ে ফেলতে না পারলে তার ফল কী হয়, সেটা হয়তো শেষপর্যন্ত ভারতবাসী বুঝবেন অনেক চড়া দাম দিয়ে। তবে, তার আগে পর্যন্ত শুধুই আঁধার, আর পাকিস্তানের মুণ্ডপাত করতে করতে একটি আপাদমস্তক পাকিস্তানে পরিণত হবার দিকে এগিয়ে চলা।' (https://4numberplatform.com/?p=16127)

মেকি সংসদীয় গণতন্ত্রের, ধামাচাপা-দেওয়া ধর্ম-রাজনীতি আপসের মুখোশ হয়তো এইভাবেই খুলবে। খোলাটা দরকার। আসন্ন আঁধার হয়তো-বা আলোর অধিক। আলোরে যে লোপ করে খায় সেই কুয়াশাই তো সর্বনেশে। দিল্লি, কলকাতা সব জায়গাতেই এখন কুয়াশা ঘন। 'ছট করে' (ছাপার ভুল) সে-কুয়াশা দূর হবে না। তাই মোহভঙ্গটা সবার আগে দরকার। এ-রায় সেদিক থেকে স্বাগত।

পুনরপি অশোকবাবুর শরণাপন্ন হই: 'আমরা আমাদের জীবদ্দশায় একটা মিথ্যা দাবিকে গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখলাম। এটা অভিজ্ঞতা হিসেবে কম মূল্যবান নয়। আর এই মিথ্যার প্রশ্নে বিভিন্ন পক্ষকে অনেকদিন ধরে চেনার সুযোগও পেলাম। সেটার মূল্য আরো বেশি। সবচাইতে বড়ো কথা, যে রাষ্ট্র তার সাংবিধানিক প্রশাসনের আওতায় এইসব ঘটনা এত কাল ধরে ঘটতে দিয়েছে, তার সেই ছদ্ম-সেকুলার মুখোশটাকে সে নিজেই ছিঁড়তে ছিঁড়তে আজ অবশেষে টান মেরে খুলেই ফেলল। যাঁরা এতদিন বোঝেননি, তাঁদের এবার চৈতন্যোদয় হবে নিশ্চয়ই।' (https://4numberplatform.com/?p=16152

শেষ করি আমাদের পাড়ার এক অকালবৃদ্ধ সবজি-বিক্রেতার মন্তব্য দিয়ে। পয়সার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না, এই খেদ জ্ঞাপন করে তিনি আধা-স্বগতোক্তির মতো করে জানালেন, 'এসব নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই, মন্দির-মসজিদ নিয়ে মাতামাতি করছে। ধর্ম-ধর্ম করে মাথা খারাপ করে দিল। ভগবান এত অবিচার সইবেন না।' ভগবান তাঁর দুঃখের দিকে নজর রাখছেন কিনা, এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করায় সেই অকাল-জ্ঞানবৃদ্ধ বললেন, 'তিনি যে নিরাকার!' এই সবজি-বিক্রেতা কি ডিইস্ট?

(ইন্টারনেট পত্রিকা *চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম*-এ ১০ নভেম্বর প্রকাশিত 'হিন্দুরাষ্ট্রের অভিমুখেই কি এগোচ্ছি আমরা?' (https://4numberplatform.com/?p=16127 শীর্ষক লেখার পরিবর্ধিত রূপ।

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে

পেরেস্ত্রৈকা পর্ব: সংস্কৃতির রূপান্তর

অরুণ সোম

মস্কো, ২৯.০৯.১৯৯২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দীর্ঘ অবরোধের মধ্যে দুরন্ত শীত আর দুর্ভিক্ষ কবলিত বিধ্বস্তপ্রায় লেনিনগ্রাদে ধ্রুপদী সংগীত রচনায় নিবিষ্ট বিশ্ববিখ্যাত সুরকার দ্মিত্রি শস্তাকোভিচ। নতুন ইতিহাসের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিচ্ছে নতুন মহাসংগীত— পরবর্তীকালে 'লেনিনগ্রাদ সিম্ফনি' নামে যার খ্যাতি।

আজকের রাশিয়া মুক্ত রাশিয়া। দ্বিতীয়, বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী দূরের বস্তু। বিপ্লবের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। সোভিয়েতের নাগপাশ থেকে সদ্যমুক্তি ঘটেছে রাশিয়ার।

নতুন রাশিয়ার পথে যেতে যেতে চমকে উঠলাম। মস্কোর পাতাল রেলের সাবওয়েতে আধা অন্ধকারাচ্ছন্ন দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে আছড়ে পড়ছে লেনিনগ্রাদ সিম্ফনির সেই সুরমূর্ছনা। বড়ো করুণ শোনাচ্ছে। Violincello, flute, saxophone, বেহালা যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রের পুরো একটা অর্কেস্ট্রা। সংগীত বিদ্যালয় থেকে সদ্য ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত বেকার সংগীত শিল্পীদের একটি দল। সামনে উলটো করে টুপি পাতা।

এ কোনো আবিষ্কার নয়। আজকাল পেরেস্ত্রৈকার কল্যাণে রাস্তায় ঘাটে যেখানে সেখানে শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অবকাশ পাবেন। এক শ্রেণির মানুষের সংগতি নেই টিকিট কেটে হলঘরে গিয়ে গানবাজনা শোনার, আবার বেশ কিছু শিল্পীর সুযোগ নেই অন্য কোনোভাবে রুজি রোজগারের। ফুটপাত আর সাবওয়েগুলি এখন এই দুই পক্ষের আদানপ্রদানের জায়গা। পথে এসে দাঁড়িয়েছে সোভিয়েত ধ্রুপদী সংগীত, যার স্থায়ী আসন ছিল বিশ্বের দরবারে।

ব্যালের দেশ বলে আমরা যাকে জানতাম সেই রাশিয়ায় আধুনিক ব্যালে শেখাতে এসেছে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এক ব্যালে ট্রুপ। গত ২৩ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মস্কোর Young Spectators Theatre-এর নাট্যমঞ্চে ফিলাডেলফিয়ার এক নৃত্য ও নাট্যগোষ্ঠী পরিবেশন করল এইড্স সমস্যা নিয়ে একটি নৃত্যনাট্য। উদ্দেশ্য এইড্স সমস্যার ওপর রুশিদের আলোকপাত করা।

কিন্তু ফুটপাতে বা খোলা মাঠে বিনামূল্যে জ্ঞান বিতরণের জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন নয়। সৌভাগ্যবান দর্শকদের কথা মাথায় রেখে দর্শনী ধার্য হয় ২৫ রুবল। অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং 'অগনিয়োক' নামে পত্রিকার তহবিল থেকে যথাক্রমে দশ লক্ষ ও এক লক্ষ রুবল পাওয়া যায়।

গণমৈত্রীর ধ্বজা এখনও আছে। তবে জনগণ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধ্যানধারণা ধীরে ধীরে পালটে যাচ্ছে এই যা।

২০১৬।। সম্প্রতি সংযোজিত একটি টীকা

বিশ্ববিখ্যাত সংগীত পরিচালক জুবিন মেহতা, যিনি ১৯৬১ সাল থেকে শুরু করে একটানা ৪৭ বছর Israel philharmonic Orchestra-র সংগীত পরিচালনার পর সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন, গত ১৭ এপ্রিল মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত এক সাক্ষাৎকারে তাঁর সুদীর্ঘ সংগীত জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে সোভিয়েত সংগীত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কথায়, ইজরায়েলের সেই অর্কেস্ট্রাতে এবং আজও অর্কেস্ট্রার প্রতিটি শিল্পী তাঁর নিজের বাছাই করা; আর "What helped very much in the 1980's was the influx of immigrants from the Soviet Union. They came on a monthly basis and we have auditions behind curtains. So we don't know who's playing— nationality, man, woman, nothing. And they were technically so endowed. *Even in the Communist times art was treated as a very important factor.*"

প্রসঙ্গত, সোভিয়েত শিল্প ও সংস্কৃতির মান যে কতটা উন্নত ছিল এবং সাধারণ জনমানসে তার যে ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তেও তার উল্লেখ করেছেন। '...পূর্বতন কালে আমীর ওমরত্তেরাই সে সমস্ত ভোগ করে এসেছেন— তখনকার দিনে যাদের পায়ে না ছিল জুতো, গায়ে ছিল ময়লা ছেঁড়া কাপড়, আহার ছিল আধ-পেটা, দেবতা মানুষ সবাইকেই যারা অহোরাত্র ভয় করে বেড়িয়েছে, পরিত্রাণের জন্যে পুরুত-পাণ্ডাকে দিয়েছে ঘুষ। আর মনিবের কাছে ধুলোয় মাথা লুটিয়ে আত্মাবমাননা করেছে তাদেরই ভিড়ে থিয়েটারে জায়গা পাওয়া যায় না।..." ('রাশিয়ার চিঠি' পত্রসংখ্যা ৬)।

‘বড়ো’দিনের সন্ধানে

দেবাঞ্জন বাগচী

প্রায় এক বছর আগে ইজরায়েলের নেগেভ মরুভূমিতে পাওয়া গেছে যীশুর এই ছবি। এক ভগ্নপ্রায় ষষ্ঠ শতকের বাইজেন্টাইন চার্চের ছাদে আঁকা এই প্রতিকৃতি যীশুর অন্যতম প্রাচীন চিত্র বলে মনে করা হচ্ছে। ছবিটি ক্যালেন্ডারের ছবির মতো পরিষ্কার না। তবে পাঠক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর যথেষ্ট অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত ও তাঁর আঁকা ছবি দেখে অভ্যস্ত। তাই রসাস্বাদন অতটা কঠিন নাও হতে পারে, এমন আশঙ্কাও রয়েছে।

এখানে যীশু বয়সে অনেক নবীন, মাথাভরতি ঝাঁকড়া চুল। চুল ঘাড় অবধি বিস্তৃত নয়। মসৃণ গাল, টিকালো নাক। চুল কাটার ঘরানা দেখে তৎকালীন মিশর ও প্যালেস্টাইন অঞ্চলের মানুষ বলে বিশেষজ্ঞদের মনে হয়েছে। এখনও প্রখ্যাত মিশরীয় ফুটবলার মহ. আল সালাহ অনেকটাই এমন চুল রাখেন। যীশুর যে চিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি, তিনি অনেকটাই ইউরোপীয় ধাঁচের, নীল চোখের পরিণত পুরুষ। এই বাইজেন্টাইন চার্চের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ইতিহাসবিদদের আবার যীশুর মুখের গড়ন নিয়ে ভাবার সুযোগ করে দেবে বলেই মনে হয়।

যীশুখ্রিস্ট। ইনি চিরকালই সারা বিশ্বের মানুষের কাছে অসংখ্য প্রশ্নের কারণ। এই লেখার একটি বড়ো অংশ জুড়ে থাকছেন তিনি। স্বীকার করি জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে লেখা ছাড়াই, তাঁর জন্ম ও ঈশ্বর পরিচিতিকে ঘিরে তৈরি প্রহেলিকাগুলিকে প্রশ্ন করছি। এমন অসংখ্য প্রশ্ন আছে, তবে আমি কয়েকটি বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকছি। যীশুর অস্তিত্বের অব্যর্থ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। যীশুর বিষয়ে প্রায় প্রতিটি তথ্য নিয়েই প্রচুর বিতর্ক আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে কোনো প্রমাণ ছাড়াই, শুধুমাত্র কিছু গস্পেলের লেখার ওপরে ভিত্তি করে এমন একটা বিষয় ধরে নেওয়া যায়! সেক্ষেত্রে কৃষ্ণ বা রামের উপস্থিতিও মানতে হয়, সংঘ পরিবারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে। সেই নিয়ে আলোচনায়ও সুযোগ পেলে অন্য দিন আসতে চাই, তবে আজ সবিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করে রাখি।

প্রথম ভাগে, তাঁর জন্মের কথা।

ক) যীশুর জন্মদিন কবে

যীশুর জন্মদিন থেকেই কিন্তু গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার শুরু নয়। ২৫ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন হিসেবে ধরা হয়। প্রথম ৩৫৪ সালে সম্ভবত বড়োদিন পালনের ঘটনা পাওয়া যায়। চার্চের তরফে এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য নেই, গস্পেলগুলি থেকেও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। তবে এই ২৫ তারিখ নিয়ে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন আর্মেনীয় উপাসকেরা। তাঁরা মনে করেন ৬ জানুয়ারি যীশুর জন্ম, সেই দিন তাঁরা পৃথিবীর সব আর্মেনিয়ান চার্চে বড়োদিন পালন করেন।

এবার আমরা যুক্তিবাদীর বা বিজ্ঞানের চোখে যদি এই তারিখ খোঁজার চেষ্টা করি, তা হলে হাতে পাই সেই রাতে ঘটা এক অনন্য ঘটনা। এক উজ্জ্বল নক্ষত্র (star Bethlehem) তিন জ্ঞানী মানুষকে পথ চিনিয়েছিল। একসময় এক বাড়ির ওপর এসে সে স্থির হল— এ কল্পকাহিনি হওয়ারই কথা। তবে যদি কেউ এর ব্যাখ্যা খোঁজেন, তাঁর জন্য সুখবর। নিকটতম এক ব্যাখ্যা হতে পারে, সেদিন একাধিক গ্রহ এক লাইনে দাঁড়িয়ে অতি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এমন ঘটনা কিন্তু ঘটেছিল ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মার্চে প্রথম সপ্তাহের এক সন্ধ্যায়। মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনি ৭ মার্চ খুব কাছে চলে আসে। সপ্তম খ্রিস্টপূর্বাব্দেও কিন্তু ২৭ মে-র রাতে বৃহস্পতি আর শনি খুব কাছে আসে। এ ছাড়াও ধূমকেতু বা সুপারনোভা দেখা গেলেও এমন হতে পারে। দ্বাদশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হ্যালির ধূমকেতু দেখা যাওয়ার কথা। সেই সময়ও হতে পারে। এ ছাড়া অন্য ধূমকেতু বা সুপারনোভা দেখা গিয়েছিল এমন তথ্যপ্রমাণ বিজ্ঞান এখনও সঠিকভাবে দিতে পারেনি। তবে এই সরণি ধরে এগোলে একটি তারা পথ চিনিয়েছিল এমন বিশ্বাস বাদ দিতে হয়। বরং এক মানবশিশুর জন্ম হয়েছিল বলেই মনে হয়।

এবার আরেকটি তথ্য আনা যাক— যীশুখ্রিস্টের জন্মকে ঘিরে যেসব গল্প প্রচলিত রয়েছে তাতে, মাঠে ভেড়ার পালের কথা উল্লেখ রয়েছে। গস্পেল অনুযায়ী, মাতা মেরি ও জোসেফ আদমশুমারিতে অংশগ্রহণের জন্য নিজের শহর

নাজারেখ থেকে বেথলেহেমের উদ্দেশে রওনা দেন। হ্যাঁ, সেই আমলেও এসব উৎপাত মানুষকে সইতে হত। বেথলেহেমেই যীশুর জন্ম হয়। এক দেবদূত যীশুর আগমনীবার্তা একদল মেষপালকের কাছে পৌঁছে দেন। মেষপালকেরা এই খুশির খবর সারা শহরে ছড়িয়ে দেয়। এখানে মজাটা হল শীতকাল হলে মাঠে ভেড়া থাকার কথা নয় কারণ শীতে ওখানে খুব ঠান্ডা হওয়ার কথা। শীতকাল lambing season নয়। অন্তত ইজরায়েলের দিকে নাকি তেমনই দেখা যেত এবং যায়। মেষপালকদের ক্রিয়াকলাপ দেখে মনে হয় এটা বসন্ত বা প্রথম গ্রীষ্মের সময়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যীশুর জন্মের তিন হাজার বছর আগে প্রায় একইভাবে আরেক ঈশ্বর ভূমিষ্ঠ হন এই অঞ্চলের কাছেই। মিশরীয় উপকথা বলে দেবী আইসিস ছিলেন কুমারী ও virgin। মিশর ভ্রমণে গাইডের কাছে শুনে অবাক হলাম, দেব-দেবীর সন্তান হোরাস ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেও তিন জ্ঞানী ব্যক্তি এসেছিলেন। এই হোরাস ও আইসিসের কাহিনি, ছবিতে মিশরের সব মন্দির ও শিল্পকর্মে দেখেছি। সেই মিশরীয় কাহিনির সঙ্গে মিলটি লক্ষণীয়। জনশ্রুতি— জ্ঞানী মানুষেরা সমমনস্ক হন, তবে দেবতার সন্তানেরা একইভাবে জন্মগ্রহণ করেন কি না এই বিষয়ে ইতিহাস নীরব।

আসি পরের প্রসঙ্গে।

খ) যীশু কি ঈশ্বর ছিলেন?

ঈশ্বর আছেন বলে যদি ধরেও নেওয়া হয়, তাও এই বিষয়টি গোলমেলে। প্রথমেই বলি এর আগে কিন্তু ঈশ্বরের এমন কিছু করার ঘটনা আব্রাহামি ধর্মে নথিভুক্ত নয়, যা ঐশ্বরিক না। বলা হয় যীশু ঈশ্বর। আব্রাহামিক ধর্মবিশ্বাস অনুসারে এর আগে ঈশ্বর কখনো এমনভাবে আবির্ভূত হননি। আদম, আব্রাহাম, নোয়া, মোজেস সকলেই বলে গেছেন ঈশ্বর অভিন্ন। আরো কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। যার ভিত্তি হিসেবে ধরলাম যীশুর বাণী বিশ্বজুড়ে যাঁরা প্রচার করেছিলেন তাঁদের দেওয়া তথ্য।

নিউ টেস্টামেন্ট তথা প্রথম গস্পেল লিখেছেন ম্যাথিউ (ম্যাথিউ ২৬.৩৯)। সেখানে যীশুকে প্রার্থনা করতে দেখা যাচ্ছে। তাই দেখে প্রশ্ন আসেই, সাধারণ মানুষ প্রার্থনা করেন, ঈশ্বর কার কাছে প্রার্থনা করবেন?

(ম্যাথিউ ২১:১০-১১) এখানে যীশুকে Prophet বলা হচ্ছে। (জন ১৪:২৮) এখানে বলা হচ্ছে যীশু বললেন 'আমি উত্তীর্ণ হব আমার পিতা, তোমাদের পিতা তথা আমার ঈশ্বর এবং তোমাদের ঈশ্বরের কাছে।' বক্তা নিজেকে শ্রোতার আসনেই রেখেছেন। তাই, যীশু যদি একসময় থেকেও থাকেন, তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলেননি। তবে হয়তো স্বভাবগুণে তিনি অনেক আলাদা ছিলেন, রাষ্ট্রের ও স্বজাতির চোখরাঙানি সত্ত্বেও নিপীড়িতের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল সাধারণের চেয়ে বেশি। তাই হয়তো তাঁর ভাবমূর্তি ছিল অতিমানবীয়। ইতিহাস বলছে আমরা তেমন মানুষকেই নেতা হিসেবে চাই, প্রায় তেমনই মানুষদের পাই। বেথলেহেম পেয়েছে যীশুকে। আজকের নেতা মিথ্যেবাদী, চোর, সিন্ডিকেট মাফিয়া হলেও তেমন তেমন মানুষের দ্বারা বন্দিতও হন। আর 'কাজ করেন', থাকেন 'সবার সাথে, সবার পাশে'। আমরা কি নেতা হিসেবে সঠিক লোককে চাই!

গ) যীশু কি ঈশ্বরের সন্তান?

প্রাণীর পরের প্রজন্ম হয় প্রাণী। উদ্ভিদের বংশবিস্তার করে পরের প্রজন্মের উদ্ভিদ। ঈশ্বরের সন্তান কি মানুষ হতে পারে? যিনি জন্ম নিলেন মানুষের গর্ভে, মানুষের মতন দেখতে হয়ে, মানুষ হিসেবে। তবে যদি কোনো মানুষ কর্মগুণে মহামানব হয়ে ওঠেন তাঁকে ঈশ্বরের সন্তান বলা হতে পারে। যীশু নিজেও বলেছেন 'ঈশ্বরকে মেনে তাঁর বর্ণিত পথে যাঁর জীবন যাপন করছেন তাঁরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান'। এখানেও কিন্তু উনি নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান বলেননি। বরং আরো অনেককে ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

(মার্ক ১২:২৮-২৯) এখানে দেখা যায় এক সাধারণ মানুষ এসে যীশুর সঙ্গে ওল্ড টেস্টামেন্ট নিয়ে আলোচনায় জানতে চান, ঈশ্বরের প্রথম নির্দেশ কী (ten commandments)। যীশু উত্তর দেন 'ইজরায়েল, ঈশ্বর বলেছেন তিনি অভিন্ন'। সুযোগ ছিল, কিন্তু যীশু বলেননি বা আভাসও দেননি যে তিনিই ঈশ্বর। আমরা সম্ভবত তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে ভগবানের পর্যায়ে উন্নীত করেছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতীয় পুরাণ অনুযায়ী কৃষ্ণও ছিলেন দেবতার সন্তান ও পশুপালক। আমাদের দেশের অবশ্য অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা চলে না। এখানে সে আমলেই কণাদ তাঁর তত্ত্বাবধানে এক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন বলে সাংসদ রামেশ পোখরিয়াল নিশান্ত জানিয়েছেন। বিষয়টি নির্ঘাত জনগণেশের খরচে ইতিমধ্যে বিশদে ব্যাখ্যাও হয়েছে কোনো বিজ্ঞানসভায়।

পরের প্রসঙ্গে যাই।

ঘ) যীশু কি ইহুদিদের রাজা ছিলেন?

চারটি গস্পেলে (প্রথমবার ম্যাথিউ ২:২) যীশুকে বলা হচ্ছে 'ইজরায়েলের রাজা' বা 'ইহুদিদের রাজা'। স্পষ্টতই রাজার জন্ম গোশালায় হওয়ার কথা নয়। অন্য ইহুদি ধর্মগুরুদের অভিযোগে ও রোম সাম্রাজ্যের দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত হয়ে, যেভাবে ওঁর ক্রুসিফিকেশনের প্রচলিত কাহিনি রয়েছে তাও রাজকীয় নয়। বিচারাধীন যীশুখ্রিস্টকে সম্রাট পাইলেট জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি ইহুদিদের রাজা কিনা। যীশু সরাসরি কোনো উত্তর দেননি। এই প্রশ্ন সবাইকে করার কথা নয়। তবে হয়তো প্রভাবশালী নেতাকে করা যেতেও পারে। যীশু পাইলেটের শত্রু ছিলেন না। নিজগুণে শত্রু হয়েছিলেন বাকি ইহুদি ধর্মগুরুদের। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসমর্থনের জন্য শাসক হিসাবে যীশুকে নিয়ে সেই দুশ্চিন্তা পাইলেটের হতেই পারে।

হেরোড-এর মৃত্যুর পর ওই এলাকায় ম্যাৎস্যন্যায়ের যুগ আসে। তাঁর তিন সন্তান সাম্রাজ্যের তিন ভাগের অধিকারী হয়। এরপর রোম থেকে অবস্থা সামলাতে পন্তিয়াস পাইলেটকে গভর্নর করে পাঠানো হয়।

জনের গস্পেল লেখা হয় যীশুর মৃত্যুর নব্বই বছর পর। তাতে বলা হয়েছে যীশু পাইলেটকে উত্তর দেন 'আমার রাজত্ব এই জগতের নয়'। যীশু যে জগতের কথা বললেন, তা কি তবে রোম সাম্রাজ্য বর্জিত কোনো জগৎ? কিন্তু তাঁর দেশ তো রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তা হলে বর্ণিত 'new kingdom' কি সময় বদলানোর স্বপ্ন বলা যায়?

তাঁর অনুগামীদের অনেকেই তাঁকে 'রাজা' বললেও সম্ভবত এটিও ছিল metaphor। যেমন— হৃদয়ের রাজা। ভুললে হবে না, একমাত্র যীশুই বিনামূল্যে মানুষের দুঃখ দূরীকরণে সচেষ্ট ছিলেন। সেই সময় বাকি ধর্মগুরুরা ছিলেন অর্থগৃধ্নু। নিজেদের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়াতে এঁরা যীশুকে False prophet আখ্যায়িত করেন দল বেঁধে। যীশুকে অভিযুক্ত করা হয় তৎকালীন ইজরায়েলের দৃষ্টিতে, মৃত্যু হয় মানুষের হাতে। দেবতার মৃত্যু হল মানুষের হাতে। মনে পড়তে পারে কৃষ্ণের মৃত্যুও হয় মানুষের হাতে, তিনিও হন্তাকে ক্ষমা করে দেন। দেবতার মৃত্যু হলে তাঁর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ কী রইল।

ঙ) যীশু কি নবী (prophet) ছিলেন?

মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মের (দুটি আব্রাহামিক ধর্ম) অনেক অমিলের মধ্যে মিলও আছে। উভয় ধর্মের বেশ কিছু নবী (prophet) এক। নাম আলাদাভাবে উচ্চারিত হয়। কয়েকটি পরিচিত নাম হল আদম, মোজেস, নোয়া এবং যীশু (মুসলিমরা বলেন মুসা ঈশা

ইত্যাদি)। উভয় ধর্মেই ইনি ঈশ্বরের দূত। মুসলিমরা এঁকে পূজা করেন না। পূজা আল্লাহ ছাড়া কারুর প্রাপ্য নয়, এমনকী হজরত মোহাম্মদেরও নয়। খ্রিস্টানদের মধ্যে আবার যীশুকে ঈশ্বরজ্ঞানে বা তাঁরা সন্তানজ্ঞানে পূজা করা হয়।

উপরে যা বললাম তার বাইরে আরেকটি মতবাদ চলে যার পক্ষে কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই, তবে ভেবে দেখা যেতেই পারে। তা হল যীশু কি ছিলেন এক প্রতিষ্ঠান-বিরোধী নেতা বা চিকিৎসক? যীশুর সম্ভাব্য জন্মের সময়ের একশো বছর আগে ও পরে ঠিক ওই অঞ্চলেই (নাজারেথ) কমপক্ষে চারটি বিদ্রোহ হয় রোমের বিরুদ্ধে। এর কারণ ছিল রোমান সাম্রাজ্যের ক্রমাগত অত্যাচার, ইহুদি মন্দির ধ্বংস, ধর্ষণ এবং ক্রমবর্ধমান করের বোঝা। যীশুর সেসব সম্বন্ধে অবিদিত না হওয়ার কোনো কারণ নেই। এর পরে যীশুর আরেকটু বেশি বয়সে নিজের ধর্মগুরু জন দ্য ব্যাপ্টিস্টকে খুন হতে দেখেন হেরড রাজার হাতে। তিনি রোম সাম্রাজ্যের পক্ষে কখনো বলেননি। নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমে বেড়েছে। এসব আজকের দিনে হলেও যে-কোনো মানুষ অন্য বিরোধী দল, রাষ্ট্র ও রাজ্য উভয় সরকারেরই সন্দেহভাজন হবেন। ‘মাওবাদী’ ‘মাওবাদী’-ও বলা হতে পারে। তখনও যা হওয়ার তাই হয়েছে।

বর্তমানে প্রযুক্তির অগ্রগতি ছাড়া অনেক কিছুই এক রয়ে গেছে। প্রান্তিক মানুষের মূল সমস্যাগুলি অনেকটাই এক। চলছে দেশবাসীর প্রতি রাষ্ট্রের বঞ্চনা, বহু ধরনের আদমশুমারি, ধর্মে আঘাত। চলছে ধর্মস্থান ধ্বংস, কাগজ খুলেই দেখছি ধর্ষণের খবরে ছয়লাপ, ক্রমবর্ধমান করের (জি এস টি) বোঝায় আর্থিক বিকাশ সাড়ে চার শতাংশে নেমে এল, যা শেষ সাড়ে চার দশকের মধ্যে নিম্নতম। আমরা চুপ। কারণ— হয় আমার তো কিছু হয়নি বা এ তো আমার একার সমস্যা না! বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, অসৎ ব্যবসায়িক মহল এবং অগণতান্ত্রিক শাসনের নাগপাশে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পরাজয় স্বীকার কোনো নতুন ঘটনা নয়। তবে সব সমস্যাই কি ঘাড়ে চাপাব রাষ্ট্রের?

যখন ছত্তিশগড় ভ্রমণে গিয়ে দেখি পুলিশ আদিবাসী কিশোরী মেয়েটির শ্লীলতাহানি করেছে, তখন বলতে ইচ্ছা করে— ছিঃ। এ রাষ্ট্রের লজ্জা। অন্যদিকে তাকালে দেখব মুম্বাইয়ের বিলাসবহুল ও আকাশছোঁয়া দামি বহুতল নিবাসী আশা সাহানি সোফায় বসে মারা গেলেন। এক বছর ফোন না পেয়ে তাঁর কৃতী সন্তান বিদেশ থেকে ফিরলেন। বৃদ্ধা মায়ের কঙ্কাল আবিষ্কার করে সফল প্রবাসী সন্তান জানতে পারলেন মা এক বছর আগেই মারা গেছেন। এ দোষও কি রাষ্ট্রের ওপর দেব? মানুষের জন্ম ও জীবন অনেকটাই তার মনের মতো হয় না। পরিবেশ, পড়াশোনা, পরিজন বেছে সে নিতে পারে না। কিন্তু আমাদের নবতিপর প্রতিবেশী নিভৃতে মারা গেলে সেটা কি আমাদেরও লজ্জা নয়? গ্রাম থেকে শহরে বাড়ি বাড়ি কাজ করেন অনেক মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা, ঘরে তাঁদের অনুপস্থিতির ফলে তাঁদের কিশোরী মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই সম্মান হারায়। সেই গ্লানি কেন আমাদেরও নয়? নাকি এই হল বাজার অর্থনীতির মজা? সবাইকে নিজের সংকীর্ণ বৃত্তে কলুর বলদের মতন আটকে ফেলা। প্রতিবেদকের ধারণা, যেটা আরো দুর্ভাগ্যজনক তা হল আমরা এক হতে পারছি না এবং কোনো মঞ্চ তৈরি হচ্ছে না। বামপন্থী দলগুলি এখনও বহুধাবিভক্ত। আসল রাজনৈতিক শত্রু কে ও কীভাবে মোকাবিলা করা হবে সেই নিয়ে আলোচনা হয়ে চলেছে।

সব রাস্তাই রোমে গিয়ে পৌঁছায়। রোম যার রাজধানী সেই ইতালিতে অনেক Roaming এর পর বামপন্থীদের উপর মানুষ ভরসা রেখেছে। তবে বর্তমানে ‘রোম’ শব্দটি শুনলেই মনে পড়ে যায়— Italian Debt Crisis। সেই দেশ প্রায় দেউলিয়া হওয়ার আগে মানুষ বামপন্থীদের সুযোগ দিল। লাতিন আমেরিকাও চোখ টানে। এমন অন্ধকারের সময়েও যখন কৃষকদের সংহত মিছিল দেখি, দেখি অনীক দত্তের মতন অরাজনৈতিক মানুষ প্রকাশ্যে সরকারি মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করছেন, অথবা দেখি যাদবপুরের প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রী রাজ্যপালকে সবিনয়ে প্রাপ্ত পুরস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন, তখন মনে হয়— এগুলি আসলে জোনাকির আলো। এ থেকে কোনো আগুন তৈরি হবে না।

New kingdom বা দিন বদলানোর আশায় সাধারণ মানুষ চিরকালই অপেক্ষায়। পরিস্থিতি এখনও ভালো নয়। সারা বিশ্বে ব্যবসায়িক মন্দা, বেকারত্বের বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচনের নামে স্বাস্থ্য-শিক্ষায় খরচ কমানো হচ্ছে। এই পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সমাজ, চাকরির বাজার, অর্থনীতি দেখে আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীত। ‘মানুষ আর কত ভয় করবে অয়দিপায়ুস’। ভয় পেতে পেতেই আমরা অপেক্ষাও করছি। কোন মানুষ, বা কোন গোষ্ঠী রাজাকে উলঙ্গ বলবে। চোখে চোখ রাখবে। যীশু যদি কল্পনার চরিত্রও হন তাতেও বাস্তব উদাহরণের অভাব নেই। মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন মার্টিন লুথার কিং, ম্যান্ডেলা, গান্ধী, ফিদেল বা চে। কয়েকজনের জনপ্রিয়তা মৃত্যুর বহু দশক পরেও বেড়ে চলেছে। জননেতা হিসেবে উপকারি, নির্লোভ, জনসংযোগকারী, সুবক্তার দু হাজার বছর আগেও জনপ্রিয়তা ছিল। সম্ভবত থাকবেও। মানুষের সমর্থনের জন্য প্রকৃত নেতাকে মানুষের কাছের ও ভরসার লোক হতে হয়। যীশুও বেথলেহেমের পথে হেঁটে হেঁটেই জনপ্রিয়তা ও ভরসা অর্জন করেন। জননেতাকে বরণ করার জন্য কখনোই রাষ্ট্র ফুলের মালা নিয়ে বসে ছিল না। তখনকার মতো এখনও শাসকের

সঙ্গে 'ইস্যুভিত্তিক' হাত মিলিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরাই অন্য নিপীড়িত জনপ্রতিনিধির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলেন। সেটা জেনে এবং সেটার সামনে দাঁড়িয়ে জননেতাকে নিজের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

যীশুর প্রতিকৃতি অনেক শিল্পী অনেকভাবে আঁকলেও তাঁর চরিত্রের একটি গুণ নিয়ে সবাই একমত। তিনি এক অচলায়তনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। যদি তা কল্পনাও হয় তা হলেও বহু বছরের যত্নে পালিত কল্পনা। যে কল্পকাহিনিতে মানুষ দেখতে চায় অবশেষে কেউ অচলায়তনকে ভাঙতে পারল। এই মুহূর্তেও মানুষ এমনই একজনকে খুঁজছে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং দিন বদলের কথা আসলে, আমরা সর্বাগ্রে বামপন্থী দলগুলিরই দিকে তাকাব। তাঁদের বুঝতে হবে তাঁরা মার্কস, লেনিন, স্তালিন, মাও যে পথই অবলম্বন করুন প্রতিবাদটা আগে করতে হবে। কোন 'ইজম'-এ দল এগোবে এই সমস্যার বৃত্তে তাঁরা আটকে। সাধারণ মানুষ কিন্তু ভেবে নিচ্ছে এটা 'escapism'। সম্ভবত এই মুহূর্তে ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে ধর্মহীন সমাজের স্বপ্ন আমাদের দেশে দেখা যায় না। তাই পৌত্তলিকতা, জাতপাত, ঈশ্বরে বা ধর্মে বিশ্বাস এগুলি নিয়েই চলতে হবে। সাম্প্রতিক অতীতে Godman চেয়ে আমরা পেলাম রাম রহিম বাবা আর আসারাম বাপু, আর বি আই গভর্নর পদে পেলাম হাতুড়ে অর্থনীতিবিদ, নেতার পদে পেলাম অসংখ্য এম এল এ ফাটাকেষ্ট আর ঘোড়ার ব্যাপারী নাকি একালের চাণক্য। আগে যাঁরা আশি বা নব্বইয়ের দশকের নেতাদের অনুরক্ত ছিলেন না তাঁরা এখন মানেন বর্তমান দেশনেতাদের চেয়ে তাঁরা অনেক ভালো ছিলেন। আমাকেই আবার আমার জীবদ্দশাতে বলতে না হয়, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর আমল ততটা খারাপ ছিল না। তাই সকালের কাগজ পড়েও আমার মতো অনেকেই স্বীকার করবেন সুদিনের স্বপ্ন দেখা ছাড়া উপায় নেই।

এক বন্ধু একটু আগে আমার প্রত্যাশা শুনে জানাল Messiah-র আগমন নাকি সময়ের অপেক্ষামাত্র! বিদেশে নাকি এক প্রযুক্তিবিদ দাবি করেছেন তিনি Messiah তৈরি করবেন। বর্তমান সময়ের সমস্যাগুলি নাকি এতটাই জটিল তার সমাধান করতে লাগবে এক 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স' সংবলিত শক্তিশালী 'সাইবর্গ'। যে মানুষের ভালো ছাড়া কিছুই করতে জানে না। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

'আচ্ছে দিন' দেখে নিলাম। সন্ধ্যা নামছে। আমরাও প্রতীক্ষায়। ক্রিসমাস এবং আগামী 'বড়ো'দিন, উভয়েরই।

কারও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যীশুখ্রিস্টের মতন মহাপুরুষের জীবন সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন তুলে ধরাই লেখকের উদ্দেশ্য। —লেখক।

লাইবেরিয়া— ছি ছি এত্তা জঞ্জাল

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

১। ভূমিকা— প্রথম দর্শন

'সিটি হল? মানে ভূতের বাড়ি?' ড্রাইভারের মুখে এরকম কথা শুনে অবাকই হলাম। সিটি হল মানে মনরোভিয়া সিটি কাউন্সিলের হেডকোয়ার্টার। তার উদ্ধারের জন্য (উদ্ধারই বলব) লাইবেরিয়ার রাজধানী মনরোভিয়াতে এসেছি বিশ্বব্যাঙ্কের হয়ে। টানা ষোলো ঘণ্টা প্লেনে। গতকাল এসে পৌঁছেছি, এখনও জেট ল্যাগ কাটেনি। মাথাটা ঠিক চলছে না। তার ওপর এইরকম মন্তব্য।

সকালবেলা ব্রেকফাস্টের সময় আমার টিমলিডার ক্রেমিনা, ক্রেমিনা ইয়াঙ্কোভা, আপাতত টিম বলতে আমরা দুজন, বাকিরা পরে আসবে, আমায় বলে দিয়েছে, সিটি হল-এর পুরো ব্যাপারটা তুমি দেখো। ওটা ঠিক করতে হবে। বাকি সব আমি দেখে নেব।

এখানে একটু ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলা দরকার। অবশ্য গতকাল এয়ারপোর্ট থেকে শহরে আসার সময়েই টের পেয়েছি। পূতিগন্ধময় শব্দটি কাকে বলে জানতাম, কিন্তু একটা পুরো শহর যে পূতিগন্ধময় হতে পারে সেটা ধারণা ছিল না। পুরো শহরে প্রায় সব জায়গায় বিরাট বিরাট স্তূপীকৃত জঞ্জাল, আর গন্ধের তো কথাই নেই। পুরো শহরেই বলতে গেলে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই, sewage সিস্টেম নেই, এমনকী, আশি শতাংশ জায়গায় সেপটিক ট্যাঙ্ক পর্যন্ত নেই। পুরো শহরের এক কোনায় অতলান্তিক-এর মুখোমুখি আমাদের হোটেল। সমুদ্রের হাওয়ায় হোটেলে বসে গন্ধ বোঝা যায় না।

লাইবেরিয়ার শেষ গৃহযুদ্ধ যখন শেষ হল ২০০৩ সালে তখন দেখা গেল তার আগের পাঁচ বছর পুরো শহরের ময়লা পরিষ্কার হয়নি। বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় (২০০৫ সালে লাইবেরিয়ার নতুন রাষ্ট্রপতি হলেন এলেন জনসন সিরলিফ, যিনি আগে বিশ্বব্যাঙ্কে চাকরি করতেন অর্থনীতিবিদ হিসেবে) একটা ইমার্জেন্সি প্রকল্প তৈরি হল শহর পরিষ্কার করার জন্য, সেও আড়াই বছর লাগল রূপান্তরিত হতে, কেননা সমস্ত ব্যবস্থাপত্রই ভেঙে পড়েছিল। আমরা যবে পৌঁছলাম তখনও পরিষ্কারের কাজ চলছে কিন্তু বেশির ভাগটাই বাকি।

সিটি হল যাবার পথে দেখি বিরাট এক বাড়ির সামনে তিনটি ভারতীয় ললনা। RAF-এর ইউনিফর্মে। একজন মেশিনগান নিয়ে গাড়ির ওপরে, বাকি দুজন অটোমেটিক বন্দুক নিয়ে টহল দিচ্ছে। আমার কৌতূহল দেখে ড্রাইভার বললে, 'ওটা বিদেশ মন্ত্রণালয়। আর মেয়েগুলো ভারতীয়। ওদের সবাই ভয় পায়। এক একটা খান্ডারনি।' ষণ্ডামার্কা আফ্রিকানরা ভারতীয় ললনাদের ভয় পায় জেনে বুকটা একটু ফুলে উঠল।

সত্যি ভূতের বাড়ি। একটা নিচু টিলার ওপর বেশ বড়ো যাকে বলে ম্যানশন। ভিতরে ঢুকে দেখি, চারদিকে মাকড়সার জাল, স্তূপীকৃত ময়লা। এক পাশে কয়েকটা ধূলি-ধূসরিত টেবিল আর চেয়ার। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট মেয়র অলিভিয়েরার সঙ্গে, কিন্তু কোথায় যাব বুঝতে পারছি না। সামনে অবশ্য একটা চওড়া সিঁড়ি আছে, উঠেই দেখলে হয়, যাব কি যাব না ভাবছি, এমন সময় দেখি পাশ থেকে এক মহিলা বললেন, 'ওয়েলকাম'। তাকিয়ে দেখি খুবই কেতাদুরস্ত লম্বা গাউন পরা এক মহিলা, পিছনে আধবয়সি একটি লোক, হাতে একটা ফাইল, গায়ে একটা কলকাতার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মার্কা কোট, চেক শার্ট। মাথার আধখানা চাঁদি চকচক করছে।

মহিলা বললেন, 'আমি মেয়র অলিভিয়েরা। আপনি? ...'

পরিচয় দিলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে কাজ করতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু আজ আমার শেষ দিন।' তারপর পিছনের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই, ইনি চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট, মিস্টার ডোকালা। এনারও আজ শেষ দিন। যাই হোক, ওপরে আসুন আমার ঘরে।'

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। সিঁড়িটা কতকাল পরিষ্কার করা হয়নি। মেয়রের ঘরের দরজায় ধুলো। বড়ো ঘর কিন্তু বিশ্রী একটা গন্ধ। চেয়ারগুলোর দিকে তাকিয়ে বসতে ইচ্ছে করে

না। মনে মনে ভাবছি, মেয়রের ঘরের যদি এই অবস্থা হয় তা হলে শহরের ওই অবস্থা হবে নাই বা কেন। মেয়র আমার দিকে তাকিয়ে এবং আমার মনের অবস্থাটা হয়তো আন্দাজ করে বললেন, 'কেউ সাড়ে এগারোটার আগে অফিসে আসে না। আমি সাধারণত বাড়ি থেকেই কাজ করি।' ইতিমধ্যে ডোকালা নিজের পকেট থেকে একটা চেকবই বার করেছেন এবং মেয়রকে দিয়ে চেকে সই করাচ্ছেন। আমি অবাক হয়ে দেখছি। এ কোথায় এসে পড়লাম রে বাবা।

মিউনিসিপ্যালিটিতে কেউ অফিসে আসে না, চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট মিউনিসিপ্যালিটির চেকবই পকেটে নিয়ে ঘোরে, কোনো ভাউচার নেই, কিছু নেই, এই জিনিস আমাকে ঠিক করতে হবে?

চেক কটা সই করে মেয়র উঠলেন, 'আলোচনা করে লাভ নেই। নতুন মেয়র দিন দুয়েক পরে আসবেন, ওনার সঙ্গেই আলাপ করবেন, কেমন?' সান্ত্বনা দিয়ে মেয়র বিদায় হলেন।

অফিসে ফিরে ক্রেমিনাকে নিজের অভিজ্ঞতা জানালাম। ক্রেমিনা হেসে বললে, 'প্রথমে আমারও তোমার মতো মনের অবস্থা হয়েছিল, ভেবেছিলাম বিশ্বব্যাঙ্কের এই প্রজেক্ট নেব না, কিন্তু ফেঁসে গেলাম। কিছু তো করতেই হবে। আর তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট সিরলিফ বিশ্বব্যাঙ্কের ওপর চাপ দিচ্ছেন। আমরা তো সৈনিক মাত্র। মাথা নাড়লাম। ঠিক। একটা পুরো শহরকে তো গোল্লায় যেতে দেওয়া যায় না। ভরসা শুধু এই, যে অবস্থায় শহরটা আছে, তার থেকে খারাপ অবস্থা হতে পারে না, সুতরাং আমরা যা করব সেটা কিছু ভালো তো হবেই।

সন্ধ্যাবেলা বারবিকিউ করা বারাকুডা মাছ এবং হুইস্কি খেয়ে মন শান্ত করলাম।

২। লাইবেরিয়া— সংক্ষেপে

আমেরিকার ক্রীতদাসরা প্রথম লাইবেরিয়াতে এসে বসবাস শুরু করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। তখন যেসব জনজাতিরা ছিল তাদের জমিজায়গা জোর করে কবজা করে, এবং তাদের উদ্বাস্তুতে রূপান্তরিত করে। এটা একটু অদ্ভুত শোনায়, তবে খুব একটা অবাক হবার কিছু নেই। যারা আমেরিকা থেকে এল তারা নিজেদের আমেরিকান সাহেবদের সমকক্ষ ভাবতে আরম্ভ করল, এবং আদিবাসীদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করল। গায়ের রং এক হলে কী হবে।

সে যাক, প্রধানত আমেরিকার টাকায় লাইবেরিয়া দেশ হিসেবে চালু হল। আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তে প্রায় একটা আমেরিকান উপনিবেশ হিসেবেই থাকল। প্রথম ঔপনিবেশিকরা এসেছিল আঠারোশো যোলো সালে কিন্তু স্বাধীনতা পেতে লেগে গেল আরো প্রায় তিরিশ বছর। তবে আমেরিকার ভরসাতেই প্রায় চলতে থাকল দেশটা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকানরা বন্দর বানিয়ে দিলে, তাতে কিছুটা লাভ হল। তারপর সব দেশের যে-কোনো জাহাজকে লাইসেন্স দিয়ে টাকা কামানো হল। স্মাগলারদের রমরমা। পরে জানা গেল দেশে লোহা এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ প্রচুর আছে। তার আগেই অবশ্য কাঠ রপ্তানি করে অনেক টাকা দেশে এসেছে, তবে তার বহুলাংশ চলে গেছে পলিটিশিয়ানদের পকেটে, এটাও নতুন কিছু নয়। তবে এসব জেনে লাভ হল না, কেননা একের পর এক গৃহযুদ্ধ লেগে গেল। ইতিমধ্যে অনেকবার গভর্নমেন্ট হয়েছে এবং পড়েছে। একসময় তিন দিক থেকে তিনটে আলাদা দল একসঙ্গে লড়াই করেছে।

শেষ গৃহযুদ্ধ হল চার্লস টেলর-এর বিরুদ্ধে। আমেরিকানরা এসে সেটা থামালে। কিন্তু এতে একটা বিরাট ভূমিকা ছিল মহিলাদের। তারা মিছিল আর প্রার্থনাসভা করে দেশব্যাপী এক আন্দোলন গড়ে তোলে। লাইবেরিয়ানরা এখনও হেসে বলে যে মহিলারা বড়ো বড়ো প্ল্যাকার্ড হাতে করে মিছিল করত।

'নো সেক্স টিল ইউ স্টপ দ্য ওয়ার'। এটা বোধহয় আফ্রিকান মহিলাদের পক্ষেই সম্ভব। ওরা পৃথিবীর বাকি মহিলাদের থেকে বোধহয় কম 'ইনহিবিটেড'। শান্তি পরিষদ বসেছিল ঘানাতে। লাইবেরিয়ার মহিলারা সেখানে গিয়ে দরজার বাইরে ধরনা দিয়ে বসেছিলেন। সন্ধি না হলে উঠবেন না।

৩। মেরি ব্রহ

নতুন মেয়র অধিষ্ঠিত হয়েছেন। দেখা করতে গেলাম। কাজ তো শুরু করতে হবে। গত দুদিনে দু-একজন অফিসারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সকলেরই মুখ চুন। কেউই ভেঙে কিছু বলছে না। যাই হোক, মেয়রের থেকে সবুজ সংকেত না পেলে তো আর এগোনো যাবে না, সুতরাং সেটা আগে থেকে নিয়ে রাখাই ভালো।

আফ্রিকাতে আমি কোনো বয়স্কা তন্বী মহিলা দেখিনি, একমাত্র ইথিওপিয়া ছাড়া। সেখানকার মহিলারা, আমার হিসাবে পৃথিবীর সবচাইতে ডাকসাইটে সুন্দরী। তাদের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। বাঙালি পাঠিকারা দোষ নেবেন না। আমার চোখে চালসে পড়েই থাকতে পারে।

যাই হোক, মেরি ব্রহ উচ্চতায় (হিল পরে) পাঁচ ফুট তিন। প্রস্থেও মানানসই। আমার দুই গালে চুমু খেয়ে যখন জড়িয়ে ধরলেন 'আমাদের উদ্ধারের জন্য এসেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ' বলে, মনে হল ছোটোখাটো একটা ভূমিকম্পের সম্মুখীন হলাম। দরাজ গলা (পরে জানলাম উনি নিউ ইয়র্কের ডক

সাইড-এ মহিলাদের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন) এবং দিলখোলা হাসি। প্রথমেই জানালেন তাঁর প্রথম কাজ সিটি হলের নোংরা পরিষ্কার করানো। হক কথা। তার ফল দেখলাম একদিনের মধ্যে। পরদিন গিয়ে দেখি, কোথাও কোনো ঝুল ধুলো বালি নেই, একগাদা লোক ঝাড়ু বালতি আর ফিনাইল দিয়ে পুরো বাড়িটা পরিষ্কার করছে। কোনো ঘর বাকি নেই। এক সপ্তাহের মধ্যে দেখলাম পুরো সিটি হলে সব কর্মচারীরা দশটার মধ্যে হাজিরা দিচ্ছে। মেয়র চরকির মতো চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং দিনে দুবার খোদ প্রেসিডেন্টের কাছে রিপোর্ট দিচ্ছেন।

বাস্তবিক মহিলা একটি ছোটোখাটো ডিনামাইট। লোকে থরথর করে কাঁপে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন কর্মচারীকে বরখাস্ত করে দিয়েছেন মেয়র। আমার দায়িত্ব হল মিউনিসিপ্যালিটির আর্থিক ব্যবস্থা ঠিক করা, পুরো অফিসের ব্যবস্থা ঠিক করে দেওয়া, এবং প্ল্যানিং দেখা। বড়ো কাজ। টাকা না থাকলে কিছুই হয় না, এই হিসাবে, আর্থিক ব্যবস্থা দিয়ে শুরু করলাম। ওদিকে ক্রেমিনা জঞ্জাল সাফ করানো নিয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় লরি কেনা হল, ভারতবর্ষ থেকে কনসালটেন্ট এল কমিউনিটি ক্যাম্পেইন করার জন্যে, অন্যান্য বিশ্বব্যাঙ্কের এক্সপার্টরা এলেন জঞ্জাল কোথায় ফেলা হবে, কী করে তা মহল্লাগুলো থেকে নিয়ে যাওয়া হবে, ইত্যাদির জন্য। এ ছাড়া আমাদের কাজ গভর্নমেন্টের সঙ্গে নানারকম আলোচনা চালিয়ে যাওয়া, পর্য্যাবরণ থেকে শুরু করে টাকা কীভাবে খরচ হবে, সবটাই।

আর মেরি ব্রহ সর্বত্র। ভোর চারটেতে নিজের বাড়ি থেকে বেরোন, পুরো শহর ঘুরে দেখেন লোকে কাজ করছে কি না। আর লোকেরা শহর নোংরা করছে কি না। খবরের কাগজে নাম হয়ে গেল জেনারেল ব্রহ। একদিন সকালে কাগজে দেখি হেডলাইন 'জেনারেলের নতুন কেরামতি'। খবরটা পড়ে না হেসে পারলাম না। ভোর পাঁচটার সময় বাজারে গিয়ে দেখেন ট্যাক্সি ড্রাইভাররা দেয়ালে কুকর্ম করছে। একপাশে দাঁড়িয়ে মেগাফোনে চেঁচিয়ে বললেন, 'zip it up, zip it up'। ড্রাইভাররা জরিমানার ভয়ে দৌড়ে পালাল।

ওদিকে আমি মাথার চুল ছিঁড়ছি। যে সংস্থার চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট সংস্থার চেকবই পকেটে নিয়ে ঘুরত, সেখানে কোথায় হিসেব, কোথায়ই বা ভাউচার, কোথায় কী। চার বছর লেজার লেখা হয়নি। নতুন করে সব তৈরি করতে হবে। ক্রেমিনার দ্বারস্থ হলাম। আমার কনসালটেন্ট চাই। কলকাতা থেকে কনসালটেন্ট এলেন, আমারই বন্ধু (কেউ যদি বলেন নেপোটিজম, ঠ্যাঙাব। আমার ধারণা ভারতীয় হিসাবে যত বেশি ভারতীয়কে সুযোগ দেওয়া যায়, ততই ভালো— আর চিরকাল তাই করে এসেছি—, রিপোর্ট লেখা শুরু করলেন কীভাবে এগোনো যায় তাই নিয়ে। তারপর আরো একজন এলেন, সরেজমিনে ব্যাপারগুলো ঠিক করার জন্যে। ট্রেনিং প্রোগ্রাম রোজ চলছে, আর রোজকার রোজ হিসাব দাখিল হচ্ছে। ট্যাক্স কালেকশনে-এর জন্য নতুন সিস্টেম চালু করা হল, ব্যাঙ্কদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে। কোনো স্টাফের পার্সোনাল ফাইল ছিল না, সেগুলো শুরু করা হল এবং প্রোমোশনের জন্য পরীক্ষা।

বলে রাখি যে বর্ণনাটা যত সহজে করলাম, তত সহজে কাজ হয়নি। প্রায় এক বছর লেগে গেল এসব করতে, তাও রোজকার রোজ নজর রাখতে হয়েছিল, কেননা দু-একটা ডিপার্টমেন্ট ছাড়া অন্যান্য সবাই কাজ জানে না। যেমন, যারা অ্যাকাউন্টস-এ কাজ করে তাদের কারো অ্যাকাউন্টসে কোনো দক্ষতাই নেই। অগত্যা, শুরু থেকে তাদের অ্যাকাউন্টিং শেখাতে হল।

এহ বাহ্য। আসল কথা হল যাকে বলে অ্যাটিচুড। যারা বহু বছর কাজ না করে মাইনে পেয়েছে, তাদের বোঝানো যে কাজ করা দরকার, আর সেটা করতে হবে হিসাবমতো, এটা একটা বড়ো সমস্যা। আমরা কিছু কিছু পেরেছিলাম এবং প্রথম বছরের শেষে অ্যানুয়াল রিপোর্টও বার করতে পেরেছিলাম।

ইতিমধ্যে দুর্নীতির উদাহরণ পেয়েছি যেমন, আগের বছরের পেট্রল বিল দেখতে গিয়ে দেখি, যেখানে মিউনিসিপ্যালিটির মোট আয় বারো কোটি টাকা, সেখানে পেট্রল কিনতে খরচ হয়েছে আড়াই কোটি টাকা। কী করে? আগের মেয়র নিজের স্বামীর নামে একটি পেট্রল পাম্প খুলে একটি অলিখিত আইন করে দিয়েছিলেন যে সব পেট্রল সেখান থেকেই কিনতে হবে। বাকিটা ভেবে নিন। এরকম আরো কত। এ ছাড়া বিল্ডিং-এর প্ল্যান পাস করা তো আছেই।

তবে সবাই একরকম নয়। কিছু ভালো অফিসারও ছিলেন। প্রায় সবাই মহিলা। ক্যারোলিনের নাম মনে পড়ে, পর্য্যাবরণের দায়িত্বে ছিলেন। উৎসাহ পাওয়াতে, জরিমানার কালেকশন বেড়ে গেল তিনগুণ। নতুন চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট, আর এক মহিলা, তাঁর শেখার আগ্রহ রীতিমতো নজর কাড়া। কিছুটা রাস্তা আমরা এগিয়ে দিতে, বাকিটা নিজেই তরতর করে এগিয়ে গেলেন। ফ্রাঙ্ক ক্রাহ, নিজের উৎসাহে এবং আমাদের সাহায্যে নতুন প্রজেক্ট রিপোর্ট বানিয়ে বিল গেটস ফাউন্ডেশন থেকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার জোগাড় করে ফেললেন।

৪। লাইবেরিয়ানরা

লাইবেরিয়া স্বাধীন হবার পর প্রায় একশো বছর পর্যন্ত দেশে ভোট দেবার অধিকার ছিল শুধু শ্বেতাঙ্গ-আফ্রিকানদের, অর্থাৎ যারা আমেরিকা থেকে এসেছিল তাদের। আদি অধিবাসীদের

কোনোরকম অধিকারই ছিল না। ফলে গৃহযুদ্ধ যখন শুরু হল, তখন বিভিন্ন আদি অধিবাসীদের গোষ্ঠী মহা উৎসাহে মারামারিতে যোগ দিলে। এখনকার লাইবেরিয়াতে আগের মতো আফ্রিকান-আমেরিকানদের অত বোলবোলাও নেই। তবে বেশ কিছু পরিবার আছে যারা এখনও নিজেদের লাইবেরিয়ার 'লর্ড' ভাবে। আর এত বছরে বিভিন্ন গোষ্ঠী যারা গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তারা এখন রাজনীতিতে এবং সরকারি চাকরিতে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। আগে লাইবেরিয়াতে দুটো জাত ছিল, 'সভ্য' আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গরা, যারা থাকত মনরোভিয়া শহরে, আর 'অসভ্য' আদিবাসীরা, যারা থাকত ক্রু টাউন-এ। ভারতবর্ষের বেশিরভাগ শহরের মতো, হোয়াইট টাউন (বা সিভিল লাইনস যাই বলুন) আর নেটিভ টাউনের মতো।

শহর বড়ো হতে হতে ক্রু টাউন শহরের মধ্যেই হয়ে গেল। বেশিরভাগ কারখানাও সেখানেই। 'নেটিভ'রা এখনও ওখানেই থাকে। যদিও কারখানা হাত গুনতি।

সত্যি বলতে কী, ২০০৫ সালের আগে পর্যন্ত দেশটাতে কিছুই হয়নি। শুধু এক ফায়ার স্টোন কোম্পানি তাদের রবারের ব্যাবসা চালিয়ে গেছে। গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আমেরিকানরা নিজেদের ঘাঁটি বসিয়েছিল প্রধানত মনরোভিয়াতে আর এয়ারপোর্টের কাছে। আমেরিকান কোম্পানি বলেই ফায়ার স্টোন বেঁচে গিয়েছিল।

সে যাই হোক, এমনিতে লাইবেরিয়ানরা সদা হাস্যমুখ। তবে সেটা আমরা বিদেশি বলেও হতে পারে। কিন্তু এটাও সত্যি যে পূর্ব আফ্রিকার থেকে অপরাধ প্রবণতা অনেক কম। যাকে বলে 'রুল অফ ল', তার প্রতি সম্মান আছে। রাস্তায় পুলিশ দেখা যায় না, যানজট হলেও না। ধর্ষণ ইত্যাদি নেই বললেই চলে। আর আফ্রিকান মহিলাদের যা দশাসই চেহারা, সহজে কেউ ছিনতাই করবার সাহসই হয়তো করে না। তবে প্রেসিডেন্ট জনসনের প্রশাসনে মহিলাদের বাড়বাড়ন্ত। কেউ একজন আমাকে বলেছিল যে সরকারে প্রায় আশি শতাংশ মহিলা। এটা পুরো সত্যি না-ও হতে পারে, কিন্তু যেখানেই গেছি, বেশিরভাগ কর্মীদেরই দেখেছি মহিলাবর্গের।

প্রেসিডেন্ট জনসন আর একটা কাজ করেছিলেন। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীদের জমি জমা রাখবার অধিকার, এবং তাদের ভোটাধিকার দেওয়া, তাদের প্রধানদের আইনত অধিকার দেওয়া, ইত্যাদি। তবে আফ্রিকান তো, কাজেই আমি থাকাকালীন যে নির্বাচন হল, (জনসন আবার জিতেছিলেন), তার একটা ইলেকশন পোস্টার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম, তাতে একটা বাঁদর আর একটা বেবুনের ছবি আঁকা, নীচে লেখা, 'monkey still working, baboon wait smal : Vote for Ellen Johnson Sirleaf।' ইংরেজিটা ধরতে নেই, ওটা ওয়েস্ট আফ্রিকান ইংরেজি।

আসার আগের দিন ভাবলাম আমার সঙ্গে যে অফিসাররা কাজ করেছেন তাঁদের একটু বিয়ার খাওয়াই। জনা পাঁচেককে বললাম, সমুদ্রের ধারে একটা ক্যাফেতে। সময়মতো পৌঁছে দেখি প্রায় জনা সতেরো গোল হয়ে বসে। মায় অফিসের দুজন পিয়ন পর্যন্ত। অবাক হলেও, কিছু বলার নেই। সবাই হইচই করে গল্প করছে। আমি ফ্রাঙ্ককে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'বক্তৃতা দিতে হবে না তো?' একগাল হেসে বললে, 'সেটা আজ নয়, কাল মেয়রের লাঞ্চে হবে। আজ শুধু বিয়ার, তুমি খাওয়াচ্ছ বলেই সবাই আনন্দ করে এসেছে।' এরপর আর কথা চলে না। ওয়েটার দেখি কয়েক ক্রেট বিয়ার দিয়ে গেল। আর প্রচুর খাবার।

লোকে দেখছি খাচ্ছে আবার বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য প্যাকেটে পুরছে। ফ্রাঙ্কের দিকে তাকাতে বললে, 'এটাই দস্তুর। এরা ভালো করে খাবে আর বাচ্চারা খাবে না? ভুলে যেয়ো না, এদেরই পরিজনদের কনটেইনারে ভরে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল চার্লস টেইলর'। সেই ভীতি, না খেতে পাওয়ার যন্ত্রণা, পরিবারের সদস্যদের হারানো, এসব রয়েই গেছে। বিল এল, আমার প্রায় চারশো ডলার গচ্চা গেল। কী আর করা যাবে।

পরের দিন মেয়রের লাঞ্চে দুটো কথা বলতে হল আমাদের সবাইকে। তবে লাঞ্চ মানেই প্রচুর মদ্যপান, ভরদুপুরে, গরমে, এবং মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান মিটিং রুমে। প্রায় জনা চল্লিশেক। খাবার পর শুরু হল নাচ, এবং মেরি ব্রহের সঙ্গে নাচ, এই অধমের, জীবনে ভোলবার নয়। চেয়ে দেখি, ক্রেমিনা কোন একটা সময় সটকেছে।

মোদ্দা কথা হল, এরা জীবনকে উপভোগ করতে শিখছে, নতুন ভাবে পুরো দেশটাকে নিজেদের বলে ভাবতে শিখছে, মনটাও অনেক পরিষ্কার। তবে এটাও বলতে হবে, দুর্নীতির অভাব নেই, কিন্তু যে দুর্নীতি ধরতে জানে, তার পক্ষে ব্যাপারগুলো বোঝা শক্ত নয়। ভাগ্যিস সেরকম লোকের বেশ অভাব, তাই চিনেরা, এবং ভারতীয়রাও, করে খাচ্ছে, সেটা মাইনিং লিজ বলুন, বা ব্যাবসাই বলুন, ভালোভাবেই করে খাচ্ছে।

একটা কথা বলে রাখি। বিশেষত বাঙালিদের জন্য। যদি কখনো ওদেশে যেতে হয়, সঙ্গে প্রচুর বই, নিদেনপক্ষে কম্পিউটারে ডাউনলোড করা বই নিয়ে যাবেন। পুরো মনরোভিয়া শহরটাতে একটাও বইয়ের দোকান নেই। পাগলের মতো ঘুরে বার করেছিলাম একটা খেলনার দোকানে আমেরিকান সোলজারদের ফেলে যাওয়া গোটা কুড়ি বই, আর সে যে কী মার্কা তা সহজেই আন্দাজ করা যায়।

৫। জঞ্জালের রকমফের

আবার মিউনিসিপ্যালিটি এবং জঞ্জালের কথায় ফিরে আসি। আর সেটা দিয়েই শেষ করব।

জঞ্জাল দুই প্রকার, সলিড, আর লিকুইড। আমাদের কাজ সলিড জঞ্জাল অর্থাৎ সলিড ওয়েস্ট নিয়ে। এখান বলে রাখা ভালো যে টয়লেটের ওয়েস্ট আর গোসলখানার ওয়েস্ট সবই সাধারণত লিকুইড ওয়েস্ট-এর মধ্যে পড়ে। সভ্য সমাজে সেটা পাইপলাইন দিয়ে ট্রিটমেন্ট প্লান্ট-এ নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের দেশে সব শহরে পাইপলাইন নেই, সুতরাং সেপটিক ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয়, আর সেগুলো মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করতে হয়।

এখানে একটা মজার গল্প বলে রাখি। অবশ্য ভুক্তভোগীরা সেই সময় মজাটা উপভোগ করতে পারেননি। সি এম ডি এ যখন প্রথম কাজ করতে নেমেছে বিশ্বব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে, তখন একটা প্রকল্প তৈরি করা হল কাশীপুরের বস্তিতে খাটা শৌচালয়ের বদলে সেপটিক ট্যাঙ্ক বসিয়ে দেওয়া হবে। তাই হল, এবং যারা মাথায় করে বিষ্ঠা নিয়ে যেত তাদের ছাঁটাই করা হল। সবই ঠিক ছিল কিন্তু মহাপ্রভুরা ভুলে গিয়েছিলেন যে সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে হয়। ফলে যা হবার তাই হল। কিছুদিন বাদে পুরো কাশীপুর গন্ধে ম' ম' করতে লাগল। সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার মেশিন আসেনি। ডাক ডাক আবার পরিষ্কার করনেওয়ালাদের। তাদের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এসে মিটিং-এ বসলেন। সব শুনেটুনে, কমিটির সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, বলে বেরিয়ে গেলেন। বড়ো সাহেবদের বুক তখন কাঁপছে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট ফিরে এসে জানান দিলেন, 'পারছি না স্যার।'

'কেন? পারছেন না কেন?'

'স্যার, ওটা জব ডেসক্রিপশনে নেই।'

বড়ো সাহেবদের মাথায় হাত, 'বিষ্ঠা পরিষ্কারের আবার জব ডেসক্রিপশন কী?'

'আছে স্যার, আছে, আপনারা তো বড়ো সাহেব, আপনারা বোঝেন না। আমাদের বহাল করা হয়েছিল কাঁচা গু পরিষ্কার করার জন্য। পচা গু পরিষ্কার করতে পারব না।'

শেষ পর্যন্ত ইউনিয়নের উচ্চতম পাণ্ডাদের হাতে পায়ে পড়ে ব্যাপারটা রফা হয়। সত্তর দশকের মাঝামাঝির ঘটনা। তার নামই হয়ে গেল 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা নাইটসয়েল স্কান্ডাল।'

কোথা থেকে কোথায় চলে গেলাম। মনরোভিয়াতে ফিরে যাই। যা বলছিলাম, মনরোভিয়াতে তখন সেপটিক ট্যাঙ্ক কেন, শহরের নব্বই শতাংশে টয়লেটও নেই, জলও নেই। সাধারণ মানুষের সামান্য স্বাস্থ্যজ্ঞানটুকুও নেই।

আমরা যা দেখলাম—

১। ময়লা যথেচ্ছ ফেলা হয়।

২। স্ক্যাভেঞ্জাররা (যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ জানা নেই), যারা ওয়েস্ট ডাম্প অর্থাৎ ওই ময়লার পাহাড় থেকে কাজের এবং অকাজের জিনিস কুড়োয়, তাদের সামান্যতম সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই (অবশ্য আমাদের দেশেও প্রায় নেই)।

৩। বেশিরভাগ লোকেরা বাড়ির বিষ্ঠা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে ময়লার ট্রলিতে ফেলে দেয়। এতে গার্বেজ কালেক্টররা আপত্তি করেছে, স্ট্রাইক প্রায় হব হব (ওই যে বলেছি জব ডেসক্রিপশন!)।

৪। সেই ময়লা যেখানে যায় সেখানে অবশ্যই শাক সবজিও থাকে। স্ক্যাভেঞ্জাররা সেই শাক সবজি তুলে এনে জলে ধুয়ে আবার বাজারে বিক্রি করে। মড়ক যে লাগেনি সেটা লাইবেরিয়ানদের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইমার্জেন্সি প্রোকিয়োরমেন্টে ট্রাক এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি, যেমন আর্থ মুভার ইত্যাদি কেনার ব্যবস্থা হল, কিন্তু দরকার লোকেদের জঞ্জাল কীভাবে ফেলতে হবে সে সম্বন্ধে সচেতন করা। তারও ব্যবস্থা হল। রেডিয়োতে প্রোগ্রাম করে, গান বেঁধে, মহল্লায় ভলেন্টিয়ারদের পাঠিয়ে, টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করে, যেসব পাড়ায় ভালো কাজ হচ্ছে সেই পাড়ার ছেলেমেয়েদের টেলিভিশনে নিয়ে এসে, স্কুলে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ক্লাস করিয়ে, বছর তিনেক পরে কিছু উপকার হল।

এদিকে রাস্তা এত খারাপ যে, একটা ট্রাক ল্যান্ডফিল (যেখানে ময়লা ফেলা হয়) অবদি গিয়ে ফিরে আসতে অনেক সময় লেগে যায়। সেটা আবার আমাদের এক্তিয়ারে নয়। কাজেই যতটা তাড়াতাড়ি শহর পরিষ্কার হবে ভেবেছিলাম, ততটা হল না। তবে যেটা হল সেটা মিউনিসিপ্যালিটির আর্থিক উন্নতি। হিসেবপত্র অনেকটাই ঠিকমতো করা গেছে। বুঝতেই পারছেন, যত সহজভাবে বলছি, কাজটা ততটাই দুরূহ।

এর ফল আমরা পেলাম যখন লাইবেরিয়া ছাড়ছি তখন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আমাকে (এবং ক্রেমিনাকে) মনরোভিয়ার Key to the City উপহার দেওয়া হল। এটাই অনেক পাওয়া।

৬। পরিশিষ্ট

আজকের দিনে পৃথিবীর অনেক শহরেই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট একটা বড়ো সমস্যা। বিশেষ করে ভারতবর্ষে তো বটেই। এর নানারকম কারণ আছে, কিন্তু একটা বড়ো কারণ হচ্ছে ভালো সিস্টেম না থাকা। এর জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকেই দায়ী করতে হয়। আমাদের দেশে সলিড

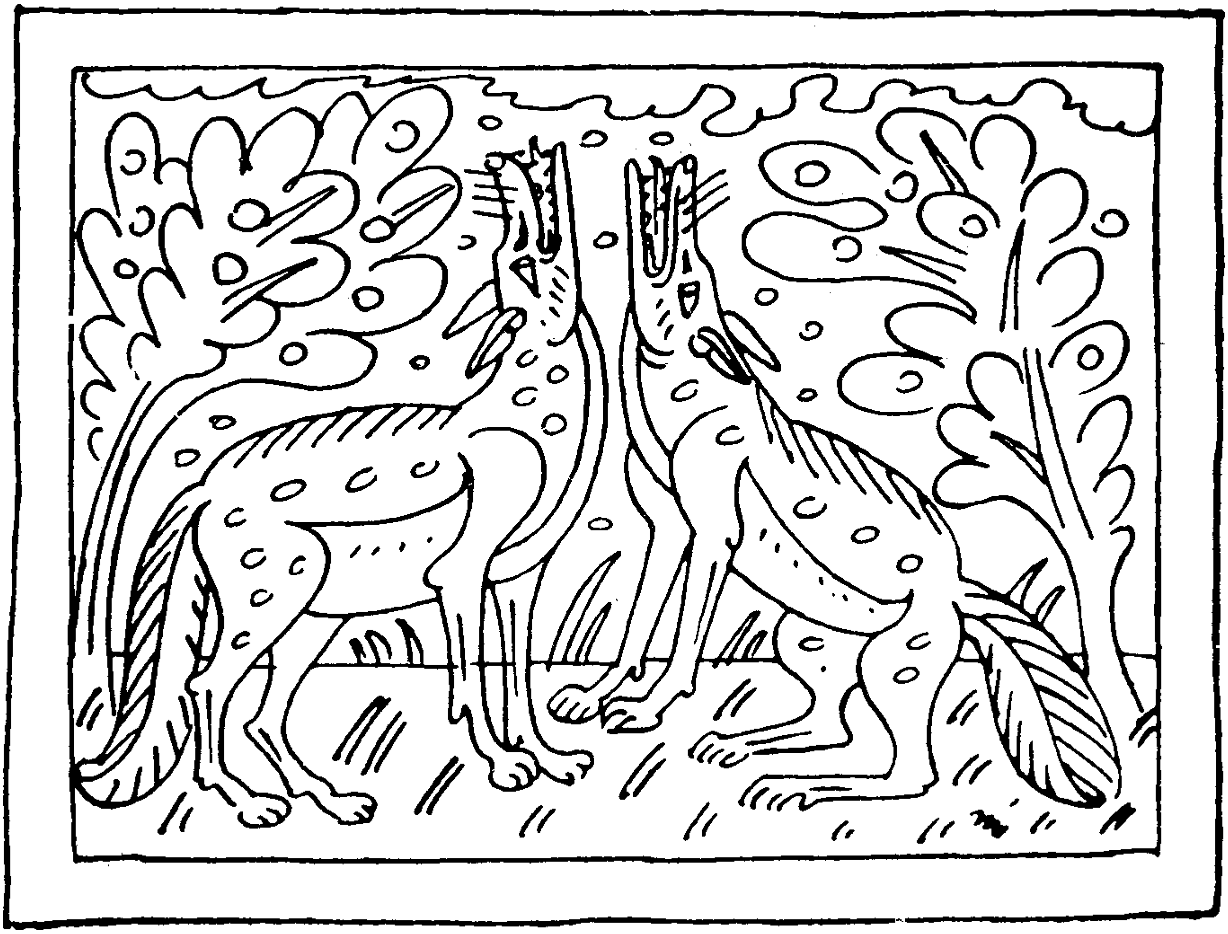

ওয়েস্ট নিয়ে কোনোরকম বড়ো চিন্তাভাবনা, হয় না বললেই চলে। দু-একটা জায়গায় হয়তো কিছু হল, কিন্তু তার বাইরে কিছু নয়। অবশ্য অনেকটা দোষ আমাদের সামাজিক চিন্তাধারারও। বড়ো বড়ো ওস্তাদরা বক্তিমে হাঁকেন, কিন্তু নিজের বাড়ির ময়লা নিজে ফেলার কথা ভাবতে পারেন না। প্রেস্টিজে লাগে তো!

আমার মনে আছে, প্রায় চল্লিশ বছর আগে, ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাঙ্কের একটা পার্টিতে সাংহাই শহরের তখনকার দিনের মেয়র এসেছিলেন। তখন সাংহাইয়ের অর্ধেক শহরটাতেই কোনোরকম ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল না। মেয়র নিজের বাড়ির বিষ্ঠা ভোরবেলা নিয়ে গিয়ে মোড়ে ময়লার গাড়িতে ফেলে আসতেন। আমাদের দেশে যারা পাঁচটা সিকিউরিটি গার্ড ছাড়া চলার কথা ভাবতেই পারে না, তারা কী করে বুঝবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কী করে হয়।

অবশ্য এসব কথা বলে লাভ নেই। আমাদের দেশে প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব নেই। অনুর্বর জমিতে ময়লা ফেলে ল্যান্ডফিল করার সময় যে সেই ল্যান্ডফিল ক্লোজার-এর খরচটা ধরে রাখতে হয় এই কথাটা ইঞ্জিনিয়ার মাত্রেই জানেন। অথচ এটা কখনোই করা হয় না। বড়ো শহরে তো নয়ই, ছোটো শহর— যেখানে এটা সহজেই সম্ভব, সেখানেও নয়। বাড়ির গার্বেজ যে আলাদা আলাদা করতে হয় (যেমন কাচ আর কাগজ, প্লাস্টিক আর লোহা ইত্যাদি), এই সামান্য জ্ঞানটা সাধারণ শহরবাসীদের নেই। মিউনিসিপ্যালিটি এই নিয়ে কোনোরকম প্রোগ্রাম করে না। শহরবাসীদের সচেতন করার চেষ্টা করে না। আমি একবার কলকাতায় কথাটা বলেছিলাম, তার উত্তর হয়েছিল, সব কিছু সেগ্রিগেট করে ফেললে, স্ক্যাভেঞ্জাররা কী করবে? খাবে কী? তাদের চিন্তায় মিউনিসিপ্যালিটির অফিসাররা এই নিয়ে ভাবেন না (অবশ্য তাদের কোনোরকম সুবিধা, যেমন জুতো বা দস্তানা)— সেও দেন না। যার ফলে আজ এই অবস্থা। বোধহয় ভারতমাতার মূর্তি, যদি গড়তেই হয়, দিল্লি বা মুম্বাইয়ের আবর্জনার স্তূপের প্রতিষ্ঠা করা উচিত। যদি কারও বিবেকে বাধে।

বিনয় ঘোষ: অন্বেষী গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানী

দিলীপ সাহা

প্রায় নিঃশব্দেই চলে গেল তাঁর শতবর্ষ। কোথাও নজরে পড়েনি তাঁর স্মরণে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা, লেখালেখি বা গ্রন্থ প্রকাশের আতিশয্য। অথচ একাধারে সমাজবিজ্ঞানী, লোকসংস্কৃতির গবেষক ও সাহিত্য-সমালোচক এই মার্কসবাদী চিন্তক আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও সারস্বত সমাজে নিতান্ত অনাদৃতই রয়ে গেলেন। তেষট্টি বছরের যাপিত জীবনে তাঁর চর্চার বিষয় ছিল প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, অর্থনীতি ও নৃতত্ত্ব, কিন্তু আগ্রহ মূলত বাংলার মন্দির, কলকাতা শহরের সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিবৃত্ত, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, চারু ও কারুশিল্পে। এদিক থেকে এই অন্বেষী গবেষক-প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষের (১৯১৭-১৯৮০) সৃষ্টিশীল প্রতিভার সম্যক মূল্যায়ন শুধু জরুরিই নয়, আত্মবিস্মৃতি সত্ত্বেও সামাজিক দায়বোধেই যা ছিল একান্ত বিবেচ্য ও অনিবার্য। আসলে ফিরে দেখাও মাঝে মাঝে কেমন যেন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে অর্থবহও। আর তাই বৈদ্যুতিন মিডিয়ার এই সর্বাত্মক বিস্ফারের যুগে তাঁর সামগ্রিক সৃজন-কর্ম পর্যালোচনার মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের পাঠকবর্গের চেতনাকে দীপিত করতেই যে এহেন নিবন্ধের অবতারণা, সে-কথা নির্দ্বিধ সত্য।

প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রত্যয়ী পথিক

উত্তাল চল্লিশ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি তখন রীতিমতো অগ্নিগর্ভ। বিশেষত, ১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলারের নাৎসি বাহিনি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হলে বদলে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র, অচিরেই সেই যুদ্ধ রূপান্তরিত হয়ে যায় জনযুদ্ধে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন বেআইনি। সেই অবস্থাতেও কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সংগ্রামরত। বলা বাহুল্য, তখনও গৃহীত হয়নি জনযুদ্ধের নীতি। তথাপি বাংলার প্রগতিশীল ও মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালনে তৎপর হয়ে ওঠেন। অবশেষে সারা দেশে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহমর্মিতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী প্রগতিশীল গণসংগঠনগুলির উদ্যোগে কলকাতার টাউনহলে আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের পৌরোহিত্যে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি', ১৯৪১ সালের ২১ জুলাই। এই সংঘের সাংগঠনিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন বামপন্থী মাসিক পত্রিকা 'অগ্রণী'-র (১৯৩৯) সাহিত্যিক গোষ্ঠী ও আনন্দবাজার পত্রিকা-র 'অনামী চক্র'-র প্রগতিমুখী সাংবাদিকতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত বিনয় ঘোষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিপূর্বেই বিনয় ঘোষ মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক নানান প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনায় অর্জন করেছিলেন বিশেষ খ্যাতি ও সমাদর। 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গঠিত হবার পর থেকে বিশেষ গুরুত্ব পায় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গ্রন্থমালা ও প্রচার-পুস্তিকার বিষয়টি। সমিতির উদ্যোগে 'সোভিয়েত সিরিজ'-এর চারটি পুস্তিকা ছাড়াও প্রকাশিত হয় দুটি গ্রন্থও: 'সোভিয়েত দেশ' এবং 'The Land of Soviets'. গোপাল হালদার ও সুকুমার মিত্র সম্পাদিত প্রবন্ধ-সংকলন 'সোভিয়েত দেশ' (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪১)-এ প্রবন্ধ লিখেছিলেন হীরেন মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, গোপাল হালদার, সরোজকুমার দত্ত, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র-সহ বিনয় ঘোষও। বিষয় বিন্যাস ও রচনার গুণগত উৎকর্ষে অসামান্য 'সোভিয়েত দেশ' গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়েছিল 'রবীন্দ্রনাথের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে'। উৎসর্গপত্রের নীচে মুদ্রিত ছিল রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক' কাব্যের ১৮ সংখ্যক কবিতার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি: 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস... দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে/প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে'। ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকা জেলার সূত্রাপুর সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'-র আহ্বানে যোগ দিতে আসা সম্মেলনে তরুণ কমিউনিস্ট কর্মী ও লেখক সোমেন চন্দ ফ্যাসিবাদী গুন্ডাদের হাতে নিহত হলে জোরালো হয়ে ওঠে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন। ২৩ মার্চ সাহিত্যিক সোমেন চন্দের নিষ্ঠুর

হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রচারিত বিবৃতিতে প্রমথ চৌধুরি, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব, অমিয় চক্রবর্তী, সুবোধ ঘোষ, হিরণকুমার সান্যাল, অরুণ মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সরোজ দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর সঙ্গে অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন বিনয় ঘোষও। ২৮ মার্চ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সম্মেলন মঞ্চে 'প্রগতি লেখক সংঘ' ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এ রূপান্তরিত হলে, সংঘের অফিস ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়ে এলে, সেই সংঘের উদ্যোগে প্রতি বুধবার আয়োজিত সাহিত্য-বৈঠকে যেসব প্রবীণ ও নবীন লেখক রচনাপাঠে অংশ নিতেন বিনয় ঘোষ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এই সময়-পর্বে ফ্যাসিজমের নিদারুণ বীভৎস রূপ সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করতে বিনয় ঘোষ লিখেছিলেন 'সংস্কৃতির দুর্দিন'। শুধু তাই নয়, বঙ্কিম মুখার্জি সম্পাদিত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা (১ এপ্রিল ১৯৪২)-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় হীরেন মুখার্জি, সুধী প্রধান, গোপাল হালদারের সঙ্গে তাঁর লেখাও 'চীনের সংগ্রাম ভারতের আদর্শ'। 'মে দিবস' সংখ্যাতেও বেরোয় তাঁর 'একতা আগে হাতিয়ার পরে'। 'অরণি' (২২ আগস্ট ১৯৪১) পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও সহায়তা করেন প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের অগ্রগণ্য এই মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী। 'অরণি'-র স্বনামধন্য সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রচারিত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থমালা' (১ জুন ১৯৪২) পর্যায়ের চারটি পুস্তিকার মধ্যে দুটি গ্রন্থই তাঁর : 'জাপানী সমাজ ও শাসন' এবং 'ভারত ও চীন'।

'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর সঙ্গে বিনয় ঘোষ তখন সক্রিয়ভাবে সংলিপ্ত। এই সংঘের সাংস্কৃতিক শাখা গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে তাঁর 'ল্যাবোরেটরী' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় কলকাতার নাট্যভারতী রঙ্গালয়ে, মে ১৯৪৩ সালে। সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' নাটিকাটিও। এছাড়াও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস চলাকালীন সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম সম্মেলনেও বাংলা প্রাদেশিক শাখা কর্তৃক 'ল্যাবোরেটরী' নাটকটি অভিনীত হয় ২৫ মে ১৯৪৩, দামোদর হল, প্যারেল, বোম্বাইয়ে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী, প্রতিনিধিবর্গ সর্বোপরি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের কাছে অভিনীত এই নাটকটি লাভ করে বিপুল সংবর্ধনা। নাটকটি সম্পর্কে নাট্যকার বিনয় ঘোষ অকপটে জানিয়েছিলেন তাঁর অভিমত:

> এদিকে সোৎসাহে আমরা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করেছি। F.S.U. (Friends of the Soviet Union) এবং 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ' স্থাপিত হয়েছে, ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রিটে। এই সময়ে 'ইপতা'-ও (I.P.T.A.— Indian Peoples' Theatre Association— সংক্ষেপে 'ইপতা' বলা হত) স্থাপিত হল। গান আর নাটকের উৎসব আরম্ভ হল। 'সোভিয়েত ভূমি বিশ্বশ্রমিক প্রিয়' গান আন্তর্জাতিকের সুরে আমরা সর্বত্র, সভা-সমিতির অনুষ্ঠানে গাইতাম। লিডার— বিনয়— আর গাইয়ে আমি, স্বর্ণকমল (ভট্টাচার্য), চিনাবাবু (চিন্মোহন সেহানবীশ), স্নেহাংশুবাবু (স্নেহাংশু আচার্য, বর্তমানে অ্যাডভোকেট জেনারেল), দিলীপ বসু, শ্রীমতী সুজাতা দেবী, শ্রীমতী সুপ্রিয়া দেবী (স্নেহাংশুবাবুর স্ত্রী) প্রভৃতি।... গান আর নাটক অভিনয়ের রীতিমতো জোয়ার এনে দিলাম আমরা। নাটক দরকার। আমি লিখলাম 'ল্যাবোরেটরী'। বিখ্যাত অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য লিখলেন 'হোমিওপ্যাথী', বিজন লিখল 'জবানবন্দী' ('একপুরুষের দুস্তর ব্যবধান', বহুরূপী, ৩৩ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬৯)।'

'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' কলকাতা থেকে 'ল্যাবোরেটরী' নাটকটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে গ্রন্থাকারে 'তিনটি নাটিকা' সংকলনে, পৌষ ১৩৫০ সালে। তিনটি দৃশ্যে বিন্যস্ত নাটকটি রাশিয়ান চলচ্চিত্র 'প্রফেসর মামলক' (জার্মান নাটক 'প্রফেসর মামলক'-এর চলচ্চিত্র রূপ)-এর প্রভাবে প্রাণিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সংকট, পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিভীষিকা নাটকটির প্রেক্ষাপট। এহেন পটভূমিকায় ল্যাবোরেটরীতে বিজ্ঞানসাধক জীবানন্দের একাগ্র সাধনা। ক্রমশ বুভুক্ষু মানুষের মিছিল ও আর্তনাদ, যুদ্ধের বাজারে কালোবাজারি, অসৎ ব্যবসায়ীদের অসাধুতা, পিতা-পুত্রের তর্কবিতর্ক, ঘরে বাইরে দ্বন্দ্বের সূত্রে অবশেষে জীবানন্দের পূর্ব ধারণার পরিবর্তন নাটকের পরিণতিতে ত্বরান্বিত করেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে নাটক ও চলচ্চিত্রের মতোই এখানে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে, একান্তে নিভৃতে বসে ল্যাবোরেটরীতে বিজ্ঞানের সাধনা সম্পূর্ণতা পায় না। বৃহত্তর মানুষের মুক্তির মধ্যেই নিহিত বৈজ্ঞানিকের যথার্থ সাধনার পরিপূর্ণতা।

সমাজবিজ্ঞানী: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে নিরীক্ষা

শতবর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭) কর্তৃক আয়োজিত 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা'-য় প্রথম আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে ছ-টি বক্তৃতা দেন (১৯৫৬-৫৭)। সেগুলি হল যথাক্রমে: 'নবযুগের মানুষ বিদ্যাসাগর', 'বিদ্যাসাগর-চরিত্রের রূপায়ণ', 'হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত বিদ্যাসাগর', 'বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ', 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ ১', 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২'। সেই বক্তৃতা-সূত্রেই প্রণীত 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', যে

গবেষণাগ্রন্থ সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের জীবন দর্শনের অনন্য কীর্তি। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করেছিল তিনখণ্ডে: কার্তিক ১৩৬৪, মাঘ ১৩৬৪ এবং ভাদ্র ১৩৬৬ সালে। তিন খণ্ড একত্রে ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ ১৯৭৩ সালে এবং পরে প্রথম ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান সংস্করণ মুদ্রিত হয় ২০১১ সালে। উনিশ শতকের বাংলার সমকালিক সামাজিক প্রতিবেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিনয় ঘোষ আলোচ্য গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের জীবন-ভাষ্য বিশ্লেষণ করেছেন মূলত স্বকীয় সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিদ্যাসাগরের মতো সম্পূর্ণ 'একক' ব্যক্তিত্বের ক্রমোন্মেষের ধারা পর্যালোচনার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে এখানে সেই অতুলনীয় মনীষার অন্তর্লীন ব্যক্তি-চরিত্রের সংগতি-অসংগতি, স্ববিরোধ ও সীমাবদ্ধতা।

মোট তিরিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ওই গবেষণাগ্রন্থটির উল্লেখ্য 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা'-র অন্তর্গত ছ-টি বক্তৃতা। যে 'মানবকেন্দ্রিক চিন্তা ও ধ্যানধারণা নবযুগের ঐতিহাসিক লক্ষণ', সেই পরিচয় সবথেকে বেশি প্রতিভাত হয়েছে বিদ্যাসাগর-চরিত্রে। 'হিউম্যানিস্টের আদশ'-ই বিদ্যাসাগরকে প্রবুদ্ধ করেছিল 'দুঃসাহসিক সমাজকল্যাণ ব্রতে'। এই কারণেই বিদ্যাসাগর বিনয় ঘোষের দৃষ্টির দর্শনে 'নবযুগের বাংলার আদর্শ নিউম্যানিস্ট'। প্রবল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদাবোধের জন্যই বিদ্যাসাগর সমকালে কোনো দল বা সমাজভুক্ত হননি। গায়ে ফতুয়া ও চাদর এবং পায়ে তালতলার চটি তো সেই অখণ্ড ব্যক্তিত্ব ও individuality-রই বহিঃপ্রকাশ। ইহজাগতিক মানবতন্ত্রে প্রত্যয়নিষ্ঠ বলেই তো সে-যুগে অর্থসর্বস্ব সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য তিনি বিদ্যাকেই 'পণ্য' করেছিলেন। এহেন বাস্তবচেতনা ও ব্যক্তিত্ববোধের নিমিত্তই তিনি 'নবযুগের প্রকৃত intellectual enterpreneur'।

বিদ্যাসাগরের চরিত্র নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অনেকেই। তবে এঁদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মন্তব্য শুধু উল্লেখ্যই নয়, প্রণিধানযোগ্যও। মধুসূদন-এর মতে বিদ্যাসাগর 'greatest Bengali that ever lived'. এছাড়াও আরো দুটি মহৎ গুণের কথা তিনি বলেছেন, 'the genius and wisdom of an ancient Sage' এবং 'the energy of an Englishman'। রবীন্দ্রনাথের উক্তি, 'আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না।' আর রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, 'এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো একটা কঠোর-কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়'। একদিকে উগ্রতা ও কঠোরতা, দুর্দমতা ও অনম্যতা, দুর্ধর্ষ বেগবত্তার মৌল বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে একজন আদর্শ নিউম্যানিস্টের চরিত্রের উপাদানে গঠিত বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সম্যক মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন বিনয় ঘোষ মূলত তাঁর অন্তর্নিহিত অস্তিত্বের স্বরূপটিকে উদ্ভাসিত করতে। তাঁর জীবন পাঁচটি পর্বে (ক্রমান্বয়ে গ্রাম্য বাল্যজীবন, নাগরিক ছাত্রজীবন, নগরকেন্দ্রিক কর্মজীবনের প্রস্তুতি, কর্মজীবনের মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নকাল) সন্নিবিষ্ট করে উনিশ শতকের নাগরিক সমাজের আবর্তে সংক্ষুব্ধ, তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতে আলোড়িত বিদ্যাসাগর-চরিত্র রূপায়ণে বিশেষত লিন্টনের ভাষায় 'the authentic individual' রূপটির বিচার করেছেন তিনি। মধ্যবিত্তসুলভ দৌর্বল্য ও ক্ষুদ্রতায় সমাকীর্ণ স্ব-শ্রেণির বিরুদ্ধে 'সুগভীর ধিক্কার' তো ছিলই, বরং সর্বার্থে এর বিপরীত বলেই 'বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন'। প্রচল সমাজ-বিন্যাসের প্রতি প্রবল বীতরাগের দরুন অনম্যতা, দুর্দমতা, অসহিষ্ণুতা, একগুঁয়েমি ও আপোশহীনতা প্রভৃতি একাধিক গুণের সমাবেশে বিকশিত হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। সেইসঙ্গে 'দেশীয় ও কুলগত চারিত্রিক সদ্‌গুণের ঐতিহ্য'-ও তাঁর চরিত্রের অন্যতম ভিত্তি হেতু তাঁর জীবনচর্চায় প্রাধান্য পেয়েছিল ঐতিহ্যবোধ ও অহম্‌বোধ সর্বোপরি 'realistic attitude'। আসলে চতুষ্পার্শ্বস্থ নীচতা ও সংকীর্ণতার মধ্যেও তিনি কখনোই 'মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে' আস্থা হারাননি। তাই সংগত মন্তব্য করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, 'বিদ্যাসাগর চরিত্রের মেরুদণ্ড কি? সে কি জিনিষ, যাহা হৃদয়ে থাকাতে তিনি সোজা পথে চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? তাহা মানবজীবনের মহত্ত্বজ্ঞান'।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্যসাধনা ও বিদ্যানুশীলনের বিচার প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ তাঁকে এদেশের একজন আদর্শ 'হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত' ও 'সাহিত্যসাধক' বলে আখ্যাত করেছেন। এই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের যোগসাধনে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন মাতৃভাষায় প্রাচীন সাহিত্য অনুবাদে, নবযুগের শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে— 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়', 'উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ কৌমুদী' প্রমুখ। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, 'হিউম্যানিজম' মুখ্যত রেনেসাঁসেরই জীবনদর্শন, যার ঐতিহাসিক বিশেষত্ব মানবকেন্দ্রিক চিন্তা। এই মানবমুখিন চিন্তাই বিদ্যাসাগরকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল ক্ল্যাসিকাল যুগের প্রাচীন বিদ্যাচর্চায়। বাংলার নবজাগরণের যুগে এহেন হিউম্যানিস্ট বিদ্যানুশীলনের ফলে নতুন 'বিচারবোধ ও জীবনবোধ' জাগ্রত করার প্রয়াসে বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠত্ব তাই অবিসংবাদিত।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শেরও ভিত্তি এই হিউম্যানিজম। মানুষই ছিল তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রেরণার উৎস। এদেশে মুক্তমতি নতুন মানুষ তৈরি করাই তো তাঁর শিক্ষা-সংস্কারের অভীষ্ট

লক্ষ্য। আধুনিক শিক্ষার আলো-ই নয়, মাতৃভাষা বাংলাকে সেই শিক্ষার যোগ্য বাহনরূপে প্রতিষ্ঠাদানে তাঁর ভূমিকাই তো সর্বাগ্রগণ্য। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তা ও রক্ষণশীলতার সম্পূর্ণ বিরোধী বিদ্যাসাগর ১৮৫২ সালের ১২ এপ্রিল সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-সংস্কার সংক্রান্ত শিরোনামে ২৬ প্যারা-সংবলিত যে খসড়া প্রণয়ন করেন তার মধ্যে তাঁর শিক্ষাদর্শের সমগ্র রূপটি প্রতিভাসিত। সেই চিন্তাপ্রসূত খসড়ায় বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা'। শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মাতৃভাষা সম্পর্কিত শিক্ষানীতির এই প্রস্তাব তাঁর অনন্য সুকৃতি। তাঁর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ মন্তব্য করেছিলেন, 'তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা'। ভাষার ভিত যাতে মজবুত, সুদৃঢ় হয় তাই ছিল তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। এবংবিধ পরিকল্পনার জন্যই রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক অভিমত, 'বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন'। মাতৃভাষায় শিক্ষা, বিভিন্ন জেলায় মডেল স্কুল স্থাপন, জনশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ব্যতীত ১৮৫০ সালের সংস্কৃত কলেজের প্রচল শিক্ষাবিধি সংস্কারের জন্য বিশদ রিপোর্ট পেশ ও ১৮৫৩ সালে বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইনের কলকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন-রিপোর্টের উত্তর সংসদে প্রেরিত তাঁর সমালোচনা এদেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিবৃত্তে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শিক্ষাসংস্কারের মতো সমাজসংস্কারেও ক্রিয়াশীল ছিল বিদ্যাসাগরের হিউম্যানিস্টের জীবনাদর্শ। তাঁর সামাজিক আদর্শের ব্যর্থতার নিদর্শনরূপে তাঁর জীবনচরিতগুলিকে দায়ী করেছেন বিনয় ঘোষ। সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর সামাজিক আদর্শ অনুধাবনে যেমন ব্যর্থ হয়েছিলেন, তেমনিই বিহারীলাল সরকার বা সুবল চন্দ্র তাঁর সামাজিক সংস্কার-কর্মকে প্রায় 'অপকর্ম' বলে সিদ্ধান্তে স্থির থেকেছেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য তাঁর সামাজিক আদর্শ সমর্থন করলেও যেসব যুক্তি আরোপ করেছেন তা প্রধানত ভাবাবেগসর্বস্ব। এই সূত্রে 'বিদ্যাসাগরচরিত'-এ রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য: 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব'। 'বহমান কালগঙ্গা'-র সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনধারার সংমিশ্রণের ফলেই বিদ্যাসাগর প্রকৃত 'আধুনিক'। নিছক মহানুভবতার তত্ত্ব খাড়া করলে তাঁর চরিত্রের আসল সত্যটাই তো চাপা পড়ে যায়। বস্তুত যে মহত্ত্বগুণে বিদ্যাসাগর 'দেশাচারের দুর্গ' নির্ভয়ে ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলেন, সেই সত্যের উপলব্ধিতেই ঘাটতি থেকে গেছে। সেকালের বাঙালি সমাজের সংকট ও অবনতি, বহুবিবাহ ও বালবৈধব্য দুই-ই বাঙালি হিন্দু সমাজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ্য অনাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন প্রধানত ঐতিহাসিক আবশ্যিকতাবোধেই। ধ্বংসোন্মুখ ব্রাহ্মণ্যশ্রেণির মুক্তিই শুধু নয়, সমগ্র বাঙালি সমাজ ও জাতির কল্যাণের জন্যই রামমোহনের মতোই বিদ্যাসাগরও সংগ্রাম করেছিলেন সেই সংকট-মুক্তির পরিত্রাণে। মনে রাখতে হবে, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ— কোনো সামাজিক সমস্যাই আদৌ তাঁর নিজের সৃষ্ট নয়। ইতিহাসের গতিমুখে চলেছিলেন বলেই তো বিদ্যাসাগর আধুনিক, প্রগতিশীল। তাঁর যাবতীয় সংস্কার-কর্মের মূলে সেই সত্যেরই স্বীকৃতি। সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে লেখা এক পত্রে যে-কথা লিখেছিলেন, 'বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই'— সেই বিধবাবিবাহের আদর্শও বিদ্যাসাগরের সমাজাদর্শেরই অন্তর্গত, যা তাঁর সংস্কার-কর্মেরই অঙ্গ। চরিতকার ও অনুরাগীবৃন্দ তাঁর যাপিত জীবন সম্বন্ধে বহুবিধ কাহিনির অবতারণার জন্য সমকাল বা পরবর্তীকালে বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কুৎসা প্রচারে তৎপর হয়েছিলেন, কখনো-বা বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ করেছিলেন, এমনকী গুণমুগ্ধরাও তাঁর সংস্কারকর্মের প্রকৃত তাৎপর্য বা গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অথচ সামাজিক সংস্কারের কাজে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল বিবেচনাপ্রসূত। ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন বিধিসম্মত হবার পর থেকেই বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণত স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কলকাতা শহরে প্রথম বিধবাবিবাহে। ১৮৫৫-৫৭ কালসীমায় তাঁর এহেন সামাজিক ক্রিয়ার যে প্রতিক্রিয়া ঘটে সমকালে বা তারও পরে আর কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে বহমান সমাজধারার সঙ্গে তাঁর কর্মধারার পরিপূর্ণ সংযুক্তির ফলে বিদ্যাসাগর তাঁর আন্দোলনকে 'সামাজিক গণআন্দোলনে' পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের জন্য বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে বহু ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল, যা এদেশের সামাজিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে অমূল্য দলিল। তিনি যে কতটা বাস্তববাদী ছিলেন তা প্রমাণিত সর্বস্বান্ত হয়েও বিধবাবিবাহ দিতে তাঁর উদ্যোগ গ্রহণে। তাঁর সামাজিক আন্দোলন ও আদর্শের ঐতিহাসিক সার্থকতা তো এখানেই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের

আঞ্চলিক সদস্য (১৯৫৮-৬০) বিনয় ঘোষ বিদ্বৎসমাজের কাছে সবচেয়ে বেশি সমাদৃত 'রবীন্দ্র পুরস্কার'-প্রাপ্ত (১৯৫৯) 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (১৯৫৭) গ্রন্থ প্রণয়নের সুবাদে। একখণ্ডে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। মোট চারটি খণ্ডে সুবিন্যস্ত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' সম্বন্ধে ভূমিকা-য় লেখক জানিয়েছিলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং আদিজনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি নয়, 'সর্বজনগোষ্ঠীর' সংস্কৃতি।... নৃবিজ্ঞানের প্রচুর উপকরণ এর মধ্যে আছে এবং যেহেতু আছে সেইজন্য তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রয়োজন আছে। সংস্কৃতির বিবর্তন আছে, তার নানাবিধ উপাদানের বিকিরণ, উপযোগ সবই আছে'। সেইসঙ্গে এ-কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি পুরাকীর্তির বিবরণ নয়। বিভিন্ন জেলার নানা রকমের লৌকিক উৎসব আচার-অনুষ্ঠান প্রথা-সংস্কার দেবদেবী দেবালয় শিল্পকলা জনগোষ্ঠী প্রভৃতির বিবরণ, যার সমগ্র রূপকে "বঙ্গজনসংস্কৃতি" বলা যায়'। নূতন সংস্করণের 'প্রথম খণ্ডে' (জুলাই ১৯৭৬) বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকড়া ও পুরুলিয়া— এই চারটি জেলার সাংস্কৃতিক বিবরণ বিদ্যমান। দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৭৮) মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি; তৃতীয় খণ্ডে (১৯৮০) মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশ পরগনা এবং চতুর্থ খণ্ডে (১৯৮৬, মৃত্যুর পরে স্ত্রী শ্রীমতী বীণা ঘোষের সহযোগিতায় প্রকাশিত) সন্নিবেশিত মাতৃপূজা, দক্ষিণরায়, বনবিবি, গাজন, মেলা, পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ ও উৎসব-অনুষ্ঠান, বনদেবতা, লোকদেবী রঙ্কিণী, বাংলার নাথধর্ম, লোকশিল্পের ক্রমিক অবনতি এবং বর্ধমানের সংস্কৃতিধারা। কেবল প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা বা রিপোর্টের ভিত্তিতে এই গ্রন্থের বিষয়-পরিচয় সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তথ্যান্বেষণের কাজের যথাযোগ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত। বাংলার অধিকাংশ উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর 'সামাজিক জীবনের সংগ্রাম-দুঃখকষ্ট-বেদনা-হতাশা-আনন্দের বিচিত্র প্রকাশ' ঘটায় লেখক শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, 'সংস্কৃতি আর সমাজের মধ্যে, সংস্কৃতি আর জীবনের মধ্যে, সাধারণ জনস্তরে সংঘাত ও সংযোগের স্তর-সূত্রগুলি কোথায়, উচ্চস্তরের সঙ্গে জনস্তরের ব্যবধানের বিশেষত্ব কী, "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" তারই খানিকটা পরিচয় পাঠকদের দিতে পারবে মনে হয়' (ভূমিকা)। সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহে একদিকে লেখকের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের পর গ্রাম অন্বেষণ অভিযান, তথ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতা, সেই সংক্রান্ত 'ফিল্ড ডায়েরি', অন্যদিকে সমাজতাত্ত্বিক বিচার ও পর্যবেক্ষণ রীতির প্রাথমিক পরীক্ষালব্ধ ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ। কারণ সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারা ও আঞ্চলিক স্বকীয়তার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক উপাদান-বিন্যাসের কার্যক্রম বা পদ্ধতি আবিষ্কার করাই ছিল লেখকের অনুসন্ধানের অন্যতম উদ্দেশ্য। সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন রীতির মাধ্যমে বঙ্গসংস্কৃতির এহেন রূপায়ণ-বিশ্লেষণই আলোচ্য গ্রন্থটিকে মণ্ডিত করেছে ভিন্ন তাৎপর্যে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের 'রক্‌ফেলার রিসার্চ ফেলো' হিসেবে কলকাতা শহরের একটা বিশেষ দিক নিয়ে বিনয় ঘোষ বছর তিনেক (১৯৫৮-৬০) নিয়োজিত ছিলেন ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের কাজে। তখন কলকাতার অর্থনৈতিক সামাজিক ইতিহাসের যেসব উপকরণ সংগ্রহ করেন তারই নির্যাস 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত' (একত্রে একখণ্ডে ১৯৭৫)। লেখকের ভাষায়, গ্রন্থটি 'মুখ্যত কলকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস'। 'সুতানুটি সমাচার', 'কলকাতা কালচার', 'টাউন কলকাতার কড়চা' ও 'কলকাতার ক্রমবিকাশ'— এই চারটি বিষয়-বিন্যাসে গ্রন্থটি বিভক্ত। উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথা দিয়ে শুরু, শেষ আধুনিক কলকাতার ক্রমবিকাশে। জীবন দিয়ে জীবনকে দেখার ইচ্ছে ও আগ্রহের জন্যই হিকির জীবনস্মৃতির তথ্যগুলি আজও সবাক ও সজীব। কলকাতা কালচারের একজন 'নিম্নমধ্যবিত্ত উত্তরাধিকারী' হিসেবে নিবন্ধকারের মনে হয়েছে, 'কলকাতা শহরটাই যেন সারা বাংলাদেশ।... মনে হয়েছে বাঙালী জীবনের প্রধান রঙ্গমঞ্চ কলকাতা শহরকে বাদ দিয়ে নব্যযুগের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।... 'কলকাতা কালচার' আগাগোড়া ইতিহাসের ধারা ছাড়া কিছু নয়।' 'টাউন কলকাতার কড়চা' কলকাতা শহরের সামাজিক জীবনের প্রধানত সরকারি মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলপত্র, তদানীন্তন পর্যটকদের স্মৃতিকথা, সাময়িকপত্র ইত্যাদির চালচিত্রবিশেষ। আর 'কলকাতার ক্রমবিকাশ' মূলত প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংবলিত আধুনিক কলকাতা শহরের ক্রমবিকাশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। সজাগ ইতিহাসবোধ ও তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গ শিল্পবোধ ও রুচির সংমিশ্রণে এই ইতিবৃত্ত হয়ে উঠেছে সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রকৃত দলিল।

'কালপেঁচা' ছদ্মনামে 'কালপেঁচার নক্‌শা', 'কালপেঁচার দু'কলম' ও 'কালপেঁচার বৈঠকে'— এই তিনটি রম্যরচনা সন্নিবেশিত হয়েছে 'কালপেঁচার রম্যরচনাসংগ্রহ'-এ (প্রথম সংস্করণ ১৯৬৮) রাজশেখর বসুর দুটি চিঠি গ্রন্থটিকে বিশেষ মর্যাদা দানে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন, 'পাঠকসমাজে হুতোম উপযুক্ত মর্যাদা পাননি, যদিও বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষা আর স্কেচ রচনার তিনিই প্রবর্তক। তাঁর নক্‌শার জের টেনে আপনি একজন বিস্মৃতপ্রায় অসামান্য লেখকের তর্পণ করেছেন, নিজেও আশ্চর্য শক্তি দেখিয়েছেন। নানা জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মনোহর

সরস ভাষায় আপনি সেকালের আর একালের কলকাতার যে খণ্ড খণ্ড বর্ণনা দিয়েছেন তা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে' (১৪.১১.৫১ তারিখে লেখা চিঠি)। 'কালপেঁচার নক্‌শা'-য় ৫৬টি, 'কালপেঁচার দু'কলম'-এ ২৩টি এবং 'কালপেঁচার বৈঠকে' ১৭টি রচনা স্থান পেয়েছে। হুতোমপেঁচার পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'কালপেঁচা'-রূপী লেখক কলকাতা প্রসঙ্গে অকপটে ব্যক্ত করেছেন তাঁর সত্যোপলব্ধি: 'বাইরের কলকাতার পালিশ বদলেছে, কিন্তু একশ বছরেও ভেতরের কলকাতার কালচার বদলায়নি। সেই কলকাতা কালচারের মূলকথা হ'ল 'হুজুক' আর 'বুজরুকি'।... কালপেঁচা বলে, ঐ হুতোম আর বুজরুকিটাই কলকাতার বনেদি কালচার' ('সেই কলকাতা!')। সেইসঙ্গে প্রশ্নও তুলেছেন, 'যেখানে জীবন-মরণের সমস্যা, সেখানে এত হুজুক কেন?... এই হ'ল কলকাতা, ক্যালাস ক্রুয়েল কলকাতা। এখানে মুষ্টিভিক্ষা হ'ল মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।' হুতোমের মতো 'সমাজের বিকৃতিগুলির উপর তীব্র বিদ্রূপবাণ' নিক্ষেপ করা কালপেঁচার অভিপ্রেত নয়। বরং বিদ্রূপ বা হাস্যরসের নেপথ্যে মানুষের জীবনে যে ট্র্যাজেডি বা কমেডি নিহিত থাকে তার দিকেই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণে একান্তভাবে নিবিষ্ট থাকতে চেয়েছেন তিনি। এখানেই এই রম্যরচনাগুলির চরিতার্থতা।

গবেষক-প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য-সমালোচক

ইংরেজদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পর পাশ্চাত্য অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ঘাত প্রতিঘাতে চারপাশের ঘনীভূত সংকট ও সার্বিক বিনাশের মধ্যেও এদেশে উনিশ শতক থেকে যে নবজাগৃতি আজও প্রবহমান, 'বাংলার নবজাগৃতি' (প্রথম সংস্করণ ১৩৫৫) তারই ইতিবৃত্ত। 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না।... বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়... বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে'? এর প্রত্যুত্তরে তিনিই বলেছেন, 'তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে।... আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি'। বাংলার নবজাগৃতির ইতিহাস লেখার এই হল গবেষক-প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষের একমাত্র 'কৈফিয়ত'। তাঁরও অভীষ্ট, 'সকলে মিলে বাঙলার প্রবহমান পরিবর্তনশীল ইতিহাসের ধারাটি অনুসরণ করা উচিত'। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যকে মান্যতা দিয়েই তিনি নবজাগৃতির ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন মূলত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমে আলোচিত নবজাগৃতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট, বাংলার নতুন শ্রেণিবিন্যাস (জমিদার, বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, মজুর শ্রেণির উদ্ভব ও তার স্বরূপ বিশ্লেষণ), বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের সংস্কৃতি সমন্বয়ের ইতিহাস ও নবজাগৃতির ভাববিপ্লবের কারণসহ বৈপ্লবিক ইতিহাস। এরপরে সংযোজিত হয়েছে বাংলার নবজাগরণের সমীক্ষা ও সমালোচনা। পরিশেষে বাংলার সাংস্কৃতিক নবজাগৃতির ইতিহাস। সংগত কারণেই এ গ্রন্থ সমাজতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, একাগ্র নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলশ্রুতি।

'জনসভার সাহিত্য' (প্রথম সংস্করণ ১৩৬২) গ্রন্থটি 'সাহিত্যের ইতিহাস' নয়। লেখকের ভাষায়, 'একে সাহিত্যিকের ইতিহাস, তাঁর সমাজের ইতিহাস এবং তাঁর পেট্রন রাজা-রাজড়া, মুদ্রক প্রকাশক ও পাঠকদের ইতিহাস বলা যায়'। আসলে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে-সাহিত্য রাজসভায় 'বন্দি' ছিল, সেই সাহিত্য কীভাবে ক্রমশ মুদক ও প্রকাশকদের আনুকূল্যে নবযুগের সংবেদী বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকসমাজের প্রণোদনায় জনসভামুখী বা জনসভার সাহিত্য হয়ে উঠছে তাই এ-গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। 'রাজসভার সাহিত্য', 'রাজসভা থেকে জনসভা' এবং 'জনসভার সাহিত্য'— এই তিনটি পর্যায়ে গ্রন্থটি বিন্যস্ত। শেষ পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারে এ-দেশের ছাপাখানা ও মুদ্রকদের সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে 'বাংলা বইয়ের ইতিবৃত্ত' নিবন্ধে। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবন শহরে বাংলা ভাষায় রোমান অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ পাদ্রি মানোএল্-দা-আসসুম্পসম্-এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ'। বাংলা বর্ণমালার প্রথম মুদ্রিত রূপ প্রকাশ্যে আসে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেডের 'A Grammar of the Bengal Language' নামিত গ্রন্থে, যা প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ সালে। উল্লেখ্য, ইংরেজিতে লেখা এই ব্যাকরণের মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ বাংলা হরফে মুদ্রিত হয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থের অংশবিশেষ। বিশেষভাবে স্মর্তব্য, বাংলায় মুদ্রণযন্ত্রের সূত্রপাত কিন্তু ওই ১৭৭৮ সাল থেকেই। বাংলা ছাপার হরফ তৈরির কাজে শুরুর দিকে বিদ্যোৎসাহী ইংরেজ সিভিলিয়ান চার্লস উইলকিন্সের সহযোগী ছিলেন হরফ-নির্মাণশিল্পী পঞ্চানন কর্মকার। তাঁর সযত্ন প্রচেষ্টাতেই যে 'মুদ্রণ হরফ নির্মাণ একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী শিল্প-এ পরিণত হয়, সেকথা অনস্বীকার্য। এরপর বাংলায় মুদ্রণশিল্প ও মুদ্রিত সাহিত্যের আদিপর্বে উইলিয়ম কেরীর উদ্যোগে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের সুকীর্তির ইতিবৃত্ত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অচিরেই মুদ্রণযুগের বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি ঘটতে থাকে। প্রচারিত হতে থাকে বাইবেলের অনুবাদসহ বাংলা পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ, অভিধান, ইতিহাস। ক্রমে মুদ্রিত গ্রন্থের দৌলতে বাংলা সাহিত্য জনসভামুখী হতে শুরু করে। প্রথম যুগের বাঙালি মুদ্রক-

প্রকাশকদের মধ্যে সর্বাগ্রে আসে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের নাম, যিনি শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় কম্পোজিটরের কাজে নিযুক্ত হয়ে ছাপাখানার কাজকর্ম আয়ত্ত করেন এবং পরে স্বাধীনভাবে 'বই-প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যাবসা' আরম্ভ করেন উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, কলকাতা শহরে। এ বিষয়ে বাঙালি প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক। ১৮১৮ সালে তাঁর 'বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস'-ই বাঙালি প্রতিষ্ঠিত বাংলার প্রথম ছাপাখানা। কেবল মুদ্রক-প্রকাশকই নন, লেখক হিসেবেও তিনি রচনা করেন একটি ইংরেজি ব্যাকরণ (১৮১৬), দায়ভাগ (১৮১৬-১৭), চিকিৎসার্ণব (১৮২০), দ্রব্যগুণ (১৮২৪) প্রভৃতি গ্রন্থ। সচিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য ছাড়াও তিনি প্রকাশ করেন 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী', 'লক্ষ্মীচরিত্র', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'চাণক্যশ্লোক', সর্বোপরি হরচন্দ্র রায়ের সহদ্যোগে 'বাঙ্গাল গেজেটি', যে পত্রিকা সম্ভবত বাঙালি প্রবর্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। তাই গঙ্গাকিশোরের প্রতি লেখকের অকুণ্ঠিত স্বীকারোক্তি: 'ব্যবসায়ের জন্য স্বাধীনভাবে প্রথম বাংলা বই প্রকাশ করা, বই বিক্রীর জন্য প্রথম বইয়ের দোকান করা, বাঙালী হয়ে প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা, বাঙালীর প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করা, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য প্রথম বিক্রীর জন্য ছাপা, প্রথম মুদ্রিত বাংলা বই চিত্রিত করা— এতগুলি কাজ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বাঙালিদের মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্‌যোগী হয়ে করেছিলেন'। এ-সম্মাননা অযৌক্তিক তো নয়ই, বরং বাংলার নবযুগের আন্দোলনে বাংলা ছাপাখানা ও বাংলা বইয়ের ইতিহাসে সচেতনভাবে তিনি যে ঐতিহাসিক দায় পালন করেছিলেন তা সংশয়াতীত দৃষ্টান্ত। গঙ্গাকিশোরের পরে 'বহুনিন্দিত' বটতলার প্রকাশকরাও নেহাত অবজ্ঞেয় ছিলেন না। উনিশ শতকে ছাপাখানা, বইপ্রকাশ ও বই বিক্রির স্বাধীন ব্যবসায়ে সবচেয়ে বেশি দূরদৃষ্টি, সৎসাহসের নজির স্থাপন করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি ছিলেন সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ও নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনে বাংলার নবজাগরণের অন্যতম অপ্রতিদ্বন্দ্বী লিবার‍্যাল হিউম্যানিস্ট।

'বাংলার বিদ্বৎসমাজ' (প্রথম সংস্করণ ১৩৮০) বাংলার বিদ্বজ্জন ও বিদ্বৎসভা সম্বন্ধে মোট আটটি প্রবন্ধের সংকলন, যার কালসীমা ১৩৬২ থেকে ১৩৭৮ সাল। লেখকের ভাষায়, ব্রিটিশ আমলে উনিশ শতকে আধুনিক যুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবীর বিকাশ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত 'বাংলার বিদ্বৎসমাজের নানাবিধ সমস্যা, সামাজিক চরিত্র ও ঐতিহাসিক ভূমিকার বিশ্লেষণ' এ-গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। বাংলার বিদ্বৎসমাজের বিকাশের ধারা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই লেখক 'বিদ্বৎজন' কথার ব্যাখ্যা করেছেন। কেবল বিদ্যার মানদণ্ডে প্রকৃত বিদ্বৎজনের বিচার নিতান্ত অমূলক। বিদ্বান হলেই তিনি বিদ্বৎসমাজভুক্ত হন না। লেখকের মতে, 'শিক্ষিত' আর 'বিদ্বৎজন' কখনোই এক নন। অধীত ও অর্জিত বিদ্যার মাধ্যমে 'স্কলার' হলেও 'ইন্টেলেকচ্যুয়াল' হওয়া যায় না। বিদ্বান হয়ে যিনি সামাজিক কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হন, কখনোই তিনি বিদ্বৎসমাজর অন্তর্ভুক্ত হবেন না। সমাজের চিন্তাধারাকে যিনি পরিচালিত করে নিজের চিন্তা দ্বারা অন্যের চিন্তাকে প্রভাবিত করেন এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানবিদ্যা আয়ত্তে অকুণ্ঠ বা অপ্রতিহত থাকেন, তিনিই যথার্থ বিদ্বৎজন। রবার্টো মিচেল্‌স-এর ভাষ্য অনুযায়ী, 'vocationally concerned with things of the mind' যিনি, তিনিই প্রকৃত inellectual হবার যোগ্য। এরপর লেখক কলকাতা শহরের কয়েকটি বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন, বিত্ত ও বিদ্যা উভয়ক্ষেত্রে যাঁরা অর্জন করেছিলেন সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা। নতুন সমাজবিন্যাসের এহেন অভিনব নিয়ন্ত্রণশক্তির ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এটাই যে, নবযুগের 'হিউম্যানিস্ট' শিক্ষা আত্মস্থ করতে অপারগ হওয়ায় আমাদের জীবনে ও সমাজে তার 'integration' সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ শিক্ষা ও সমীকরণের মধ্যে ফাঁক থাকায় বাংলার বিদ্বৎসমাজের জীবনে অনতিকালের মধ্যেই ফাটল ধরে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ঘনীভূত হচ্ছিল বিদ্বৎসমাজের সমস্যাজনিত সংকট। সেইসব সমস্যার মধ্যে প্রকট হল: জীবিকার সমস্যা ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা। সবথেকে বড়ো সমস্যা বাঙালি বুদ্ধিজীবীর 'intellectual dessication'-এর সমস্যা। বর্তমান সমাজ ও তার ভেতরের অনড় প্রাতিষ্ঠানিক গড়নের বদল না ঘটলে এ-সমস্যার সমাধান প্রায় অসম্ভব। সভা-সমিতি আধুনিক যুগে মানুষের সামাজিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। এই সূত্রে লেখক 'বিদ্বৎসভা'-র সংজ্ঞা নির্ধারণ করে সমাজ-জীবনে তার গভীর ও ব্যাপক প্রভাবের কথা আলোচনা করেছেন। রাজনৈতিক সভা, বাণিজ্যিক সভা, ক্লাব-প্রাতিষ্ঠানিক সভা-সমিতির সঙ্গে অবশ্যই 'বিদ্বৎসভা'-র পার্থক্য আছে। কারণ 'জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও আলোচনা'-ই এই সভার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজের শিক্ষিত ও বিদ্বান ব্যক্তিরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে, বিদ্যার আদান-প্রদানে যে সভা স্থাপন করেন, তাকেই বলে 'বিদ্বৎসভা', যার মূলকথা 'ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বীকৃতি, স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির অধিকার'। স্যার উইলিয়াম জোন্‌স-এর উদ্যোগে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪) প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিক্ষিত বাঙালিদের সযত্ন প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় রামমোহন রায়ের 'আত্মীয়সভা' (১৮১৫), ডিরোজিও-র নেতৃত্বে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' (১৮২৭-২৮), 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হিন্দু

অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৩০), 'জ্ঞানসন্দীপন সভা' (১৮৩০), 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' (১৮৩২), 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৮), 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯), 'বেথুন সোসাইটি' (১৮৫১), 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' (১৮৫৩), 'সুহৃদ্-সমিতি' (১৮৫৪), 'ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব' (১৮৫৭), 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা' (১৮৬৭)। এরপর লেখক 'বিদ্যা বিদ্বান বিদ্যালয় বিদ্যার্থী বিদ্রোহ'-এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন করেছেন 'বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ক্রমবিকাশ' ও তার ভূমিকার।

বাংলার লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে ১১টি প্রবন্ধের সংকলন নিয়ে প্রণীত হয়েছে 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' (প্রথম সংস্করণ ১৩৮৬)। আলোচিত বিষয়গুলি সমাজবিজ্ঞানসম্মতভাবে লেখা। 'লোকসংস্কৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ' নিবন্ধে লেখক অভিনিবিষ্ট থেকেছেন লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ভাবসম্পদ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বমানবৈক্যের জীবনদর্শন' আবিষ্কারে। বিশেষত বাংলার সংস্কৃতির বহুমুখী ধারার সঙ্গে মানববিজ্ঞানীর দৃষ্টি ও নিষ্ঠার বিস্ময়কর মিলনে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই হয়ে উঠেছিলেন লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ। বাংলার ব্রত পর্যালোচনা অবনীন্দ্রনাথের একদিকে প্রখর ইতিহাসবোধ, অন্যদিকে বিশ্লেষণধর্মী বুদ্ধি ও মননের আশ্চর্য প্রতিভাস। রাঢ়ের মৃৎশিল্প, ডোকরা শিল্প, পটুয়া ও পটশিল্পের বিস্তৃত পরিচয়দানের পর লেখক প্রাগ্রসর হয়েছেন লোকশিল্পের ক্রমিক অবনতির কারণানুসন্ধানে। পরিবর্তিত সামাজিক তরঙ্গাঘাতে অধুনা লোকশিল্পের ধারা ক্রমে বিলীয়মান। এইসব শিল্পীদের অনেকেই আজ সংস্কৃতির অঙ্গন ছেড়ে পা বাড়িয়েছেন লাভজনক বৃত্তিতে, আবার কেউ-বা পরিণত হয়েছেন মিস্ত্রি-মজুর বা চাষিতে। যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাও প্রায় নিঃশেষিত। এদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে একমাত্র উপযুক্ত সংরক্ষণ ও সরকারি ব্যবস্থার বদান্যতা।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (দু-খণ্ডে: ১৯৩২) ও 'বাংলা সাময়িকপত্র' (১ম খণ্ড: ১৮১৮-১৮৬৮), (২য় খণ্ড: ১৮৬৮-১৯০০) বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে তো বটেই, ঐতিহাসিকদের কাছেও আকর গ্রন্থ। দীর্ঘদিন এ-জাতীয় উল্লেখযোগ্য রচনা-সংকলন অপ্রকাশহেতু ১৯৫৯ সালে পাঁচ খণ্ডে 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন অন্বেষী গবেষক-প্রাবন্ধিক ও সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ। প্রথম সংগ্রহের কাজ শুরু হয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-এর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা নিয়ে, যা আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬২ সালে। তারপর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', 'বিদ্যাদর্শন', 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' এবং 'সোমপ্রকাশ' প্রমুখ দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার সংকলন প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৩, ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালে। 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' (১৮০০-১৯০০) এই সিরিজের শেষ বা উপসংহার-খণ্ড। বিবিধ গ্রন্থাগার, ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ওইসব দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকার তথ্যানুসন্ধান, ইতিহাসের উপকরণ নির্বাচন, কপি ও সম্পাদনার কাজ শেষ করতে বিনয় ঘোষের সময় লেগেছিল দশ বছর। সামাজিক ইতিহাসের উপাদান এ-দেশে অত্যল্প বলেই পুরাতন সাময়িকপত্রের এহেন উপাদানের মূল্য এত বেশি।

'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' প্রথম খণ্ডের ব্যাপ্তিকাল ১৮৪০-১৯০৫। অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, বিবিধ বিষয়সূচিতে পরিকীর্ণ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রচনা-সংকলন। সদ্যোজাত বাংলা গদ্যভাষাকে 'নবযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের সুযোগ্য বাহন' হিসেবে শিক্ষিতজনের সামনে সচেতনভাবে তুলে ধরতে উদ্যোগী হয়েছিলেন গুপ্তকবি তাঁর 'সংবাদ-প্রভাকর' (১৮৩১ সাপ্তাহিক, ১৮৩৯ দৈনিক, ১৮৫৩ মাসিক) পত্রিকায়, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যা তাঁর 'অদ্বিতীয় কীর্তি'। সম্পাদক-সংকলক বিনয় ঘোষও একই মতের পোষক: 'বাংলাদেশে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাচীন কীর্তি পুনরুদ্ধারের কাজে' প্রভাকর-সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই প্রথম পথপ্রদর্শক। দ্বিতীয় খণ্ড অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩ মাসিক)-য় প্রাধান্য পেয়েছে সমাজ ও অর্থনীতি, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গ। অক্ষয়কুমার দত্তের সৃজন-নৈপুণ্যে একান্ত মুগ্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯)-র মুখপত্র হিসেবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক নিযুক্ত করেন। অবিলম্বে এই পত্রিকার সঙ্গে স্থাপিত হয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত সম্পাদনা কালে 'আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভিত' গড়ে ওঠে প্রধানত এই পত্রিকার মাধ্যমেই। 'ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের প্রত্যয়-সন্ধানী সংগ্রামের ইতিহাস' এই পত্রিকার প্রতিপাদ্য বিষয়। তৃতীয় খণ্ড (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪) চারটি পত্রিকার সংকলনে সমৃদ্ধ। যেমন 'সম্বাদ ভাস্কর' (১৮৩৯ সাপ্তাহিক), 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (১৮৪২ এপ্রিল মাসিক, ১৮৪২ সেপ্টেম্বর পাক্ষিক, ১৮৪৩ মার্চ সাপ্তাহিক), 'বিদ্যাদর্শন পত্রিকা' (১৮৪২ মাসিক) ও 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' (১৮৫০ মাসিক)। 'সম্বাদ ভাস্কর' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনাথ রায় হলেও কার্যত সম্পাদকের আসল দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্পাদন করতেন পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, যিনি পরিচিত ছিলেন 'গুড়্গুড়ে ভট্চাজ' নামে। প্রথমে সাপ্তাহিক (মার্চ ১৮৩৯), জানুয়ারি ১৮৪৮ থেকে অর্ধ-সাপ্তাহিক এবং ১৮৪৯ থেকে বারত্রয়িক পত্ররূপে প্রচারিত হতে থাকে 'সম্বাদ ভাস্কর'। একদিকে 'সম্পাদকের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং দৃষ্টির স্বচ্ছতা', অপরদিকে 'প্রকাশভঙ্গি ও ভাষার বলিষ্ঠতায়' পত্রিকাটি সমকালে এ-দেশের

সাংবাদিকতার ইতিবৃত্তে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ-এর মতো ঐতিহাসিক ঘটনাসহ বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম বিষয়ক সংবাদ ও আলোচনার মাধ্যমে জনমত সংগঠনে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর সে-কালে পালন করেছিলেন সামাজিক ও ঐতিহাসিক দায়। অজ্ঞ জনগণকে স্বদেশের বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে ইয়ং বেঙ্গল-এর প্রবক্তারা উদ্যোগী হয়েছিলেন 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (১৮৪২) পত্রিকা প্রকাশের। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম প্রবক্তা রামগোপাল ঘোষ ও তাঁর কতিপয় বন্ধুর সহযোগিতায়। এই পত্রিকায় ধর্মসভার কার্যকলাপের সমালোচনার পাশাপাশি আলোচ্য ছিল সমকালে সমাজ ও শিক্ষা বিশেষত বহুবিবাহ ও জাতিভেদ সমস্যার মতো বিষয়ও। নভেম্বর ১৮৪৩ থেকে বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকার প্রকাশ। 'বিদ্যাদর্শন পত্রিকা' প্রচারিত হয় মাসিক পত্ররূপে। এই পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত প্রায় সম্পাদকের মতো। পত্রিকাটির কার্যকাল সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র ছয় মাসের। সংকলন এ-পত্রিকার বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে 'সম্পাদকীয়'-তে জানিয়েছেন, 'প্রগতিশীল সমাজসংস্কারের আদর্শ পত্রিকার প্রত্যেকটি রচনায় সুপরিস্ফুট। বহুবিবাহ, অধিবেশন, এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ব্যভিচারের কারণ, হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাবুদ্ধির সৎপরামর্শ, বঙ্গদেশের বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি রচনা তার নিদর্শন'। 'সর্বশুভকরী সভা' (১৮৪৯-৫০)-এর মুখপত্র 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' মাসিকপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। এই পত্রিকাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে পত্রিকা প্রকাশে উদ্‌যোগী হন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহকর্মী বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার। দুর্নীতি ও কদাচার থেকে সমাজকে মুক্ত করাই ছিল পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' ও দ্বিতীয় সংখ্যায় 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে প্রবন্ধ লেখেন যথাক্রমে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার। চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্গত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮) পত্রিকাটির রচনা সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। পত্রিকাটির উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে প্রকৃত সাংবাদিকতার আদর্শ গড়ে তোলায় পত্রিকাটি সমকালে হয়ে উঠেছিল শিক্ষিত উদারপন্থী বাঙালি মধ্যবিত্তের অন্যতম মুখপত্র। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে 'সোমপ্রকাশ'-এর স্বাতন্ত্র্য বস্তুত সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সদর্থক আলোচনায়। মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা পত্রিকাটির জনপ্রিয়তার মূল কারণ। 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থ সিরিজের পঞ্চম বা শেষ খণ্ড 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' (১৮০০-১৯০০)-র প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৬৮ সালে। সংকলন-সম্পাদক বিনয় ঘোষ প্রধানত সমাজতাত্ত্বিক (Sociological) দৃষ্টির দর্শনে তন্নিষ্ঠ থেকেছেন বাঙালি সমাজের পরিবর্তনের মৌল ধারা ও প্রকৃতি বিচারে। নিঃসন্দেহে এ-প্রয়াস দুঃসাহসিক। গ্রাম্যসমাজের পরিবর্তনের গতি, নাগরিক সমাজের রূপায়ণ, বাঙালির শিল্পোদ্যম, বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সামাজিক জীবনের প্রবাহ— এই পাঁচটি বিষয়ে সন্নিবদ্ধ 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা'।

মোট পনেরোটি অধ্যায়ে আলোচিত বিনয় ঘোষ-এর মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ' প্রবন্ধ-গ্রন্থটির প্রকাশ (প্রথম সংস্করণ) নভেম্বর ১৯৭৩ সালে। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে লেখা বলে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিশ্লিষ্ট মনে হলেও সমাজবিজ্ঞানীর নির্মোহ নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ লেখাগুলিকে সংহত করেছে এক অনিবার্য ঐক্যসূত্রে। মহানগরে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ও বিস্তার, অটোমোবিল 'ইমেজ', আধুনিক এই টেকনোলজিকাল সমাজে তরুণ মনের বিদ্রোহ, বিচ্ছিন্নতার সমস্যা, বিপ্লব বিলাস, কমিউনিজমের সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়-সমূহের যাবতীয় প্রশ্নাদির কাঙ্ক্ষিত সমাধানের উত্তর-সন্ধানে একাগ্র থেকেছেন লেখক। 'বিপ্লব মহানগর মধ্যবিত্ত এবং মার্কসবাদ' নিবন্ধটি আলোচ্য গ্রন্থটির ভরকেন্দ্র। ৩৫ পঙ্‌ক্তির একটি স্বরচিত কবিতা সহযোগে নিবন্ধটির সূচনা। সমাজজীবনের বিচ্ছিন্ন খণ্ডচিত্রের সমবায়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখানে লেখকের জীবনাদর্শ। পরিবার থেকে বৃহত্তর সমাজ পর্যন্ত জীবন যেহেতু ভঙ্গুর, স্বভাবত আজকের এই 'বেসুর বেতাল বেআব্রু জীবন' নিয়ে আর যাই হোক কোনো 'মন্তাজ' বা 'সিম্‌ফনি' রচনা লেখকের মতে সম্পূর্ণ নিরর্থক। একদিকে সমাজে দারিদ্র্যের প্রসার, অন্যদিকে শাসকের শোষণযন্ত্রের বিস্তারে মানুষের জীবনে সুদৃঢ় হয়েছে 'পরাধীনতার নাগবন্ধন': 'ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতার মুখোশ পরে ব্যক্তিদাসত্বের অভিনব নৃত্য চলেছে। এক একটা বিপ্লবের বিলোড়ন থেকে এক একটি 'স্বাধীনতা'র প্রত্যয় উদ্ভূত হয়েছে, তারপর সেই বিপ্লবের নায়কদের প্রভুত্ব বজায়ের স্বার্থে রচিত বিধিবিধানের বেদীমূলে সেই স্বাধীনতা বিসর্জিত হয়েছে। আজও ইতিহাসের এই আবৃত্তি শেষ হয়নি। ধনতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক কোনো সমাজেই হয়নি'। তাঁর সত্যোপলব্ধি, আমাদের মতো ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী অথবা ধনতান্ত্রিক সমাজের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে 'পূর্বসংস্কার' ছেড়ে সম্পূর্ণ 'মোহমুক্ত' হয়ে সামাজিক রাষ্ট্রিক 'নৈরাজ্যের আন্তর তাৎপর্য' বোঝা অসম্ভব, কারণ বুদ্ধিজীবীদের শাসন শোষণের নিদারুণ

যন্ত্রণা তেমনভাবে ভোগ করতে হয় না। ইতিহাসে তাঁদের ভূমিকা শাসকশ্রেণির পারিষদের মতো, তাই তাঁদের বিচার-বুদ্ধিতে বর্তমান 'নৈরাজ্য-বিক্ষোভ-বিদ্রোহের ব্যাখ্যা' প্রত্যাশিত নয়। বিশেষ করে 'নিপীড়িত মানুষের একমাত্র অবলম্বন ও অনুপ্রাণনার উৎস বৈপ্লবিক মার্কসীয় চিন্তাধারায় পরিপার্শ্বের পয়োনালী থেকে রাশি রাশি আবর্জনা এসে ঢুকেছে', আর তারই ফলে দেখা দিয়েছে অনেক 'বিকার বিভ্রান্তি' বা 'মধ্যবিত্তসুলভ যাবতীয় গোঁড়ামি সংস্কার চিত্তদৌর্বল্য স্বার্থপরতা আত্মম্ভরিতা সুবিধাবাদ আজ মার্কসীয় চিন্তাধারাকে পঙ্কিল করে তুলেছে'— এ-জাতীয় মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত অনেকের কাছেই না-পসন্দ্ হতে পারে। একদা মার্কসীয় মতাদর্শে প্রত্যয়নিষ্ঠ-এর এহেন বক্তব্যে কারও মনে হতেই পারে 'সংকীর্ণতাবাদের ঝোঁক'। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, এ-আলোচনা বা সমালোচনা সবই লেখকের নিজস্ব মত। তাই বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তও একান্তভাবে তাঁরই। তাই তো নিবন্ধের শেষে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি: 'বিপ্লবের কোনো গতিধারাই অচল অটল অপরিবর্তনীয় নয়। বিপ্লবের গতি অনুযায়ী তার ধারা নগর থেকে গ্রাম-অভিমুখীও হতে পারে। সেইরকম শুধু কৃষকই যে বিপ্লবের ধারক-বাহক হবে তা নয়। শহরের সংগঠিত বিপ্লব-সচেতন মজুরশ্রেণী নিশ্চয় বিপ্লবের ধারক-বাহক হতে পারে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তাই হওয়াই বিজ্ঞানসম্মত'। সমগ্র প্রবন্ধটি পড়ে কারও-বা এ-কথাও মনে হতে পারে, লেখকের বক্তব্য 'পরস্পর-বিরোধী'। কিন্তু সে-সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলেই তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন 'পরিশিষ্ট' অংশে 'মেট্রোপলিটন মন ইত্যাদি প্রসঙ্গে': 'কোনো সমস্যার সমাধান অথবা কোনো প্রশ্নের উত্তর অথবা কোনো সারগর্ভ জ্ঞান দান করার জন্য লেখাগুলি লিখিনি। মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানে আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও একথা ভুলিনি যে হাজার-হোক আমি 'মধ্যবিত্ত' বা 'পেটিবুর্জোয়া' মাত্র এবং আমার চিন্তার সীমারেখা থাকবেই, তার মধ্যে স্ববিরোধও থাকবে'। আলোচনা শেষ করেছেন এইভাবে, 'মার্ক্যুসের... চমকপ্রদ 'লাডাইট' চিন্তার ফাঁদে অনেকসময় মার্কসবাদীরাও অজান্তে আটকে পড়েন। লেখক নিজেও যে তাই পড়েছেন মধ্যে মধ্যে, এই বইয়ের একাধিক লেখা পড়তে পড়তে পাঠকদের তা মনে হবে' ('পরিশিষ্ট', বিপ্লব ও বুদ্ধিজীবী)। এ স্বীকারোক্তির মধ্যে 'চাতুরি' নেই, বরং 'সততা' আছে। তা ছাড়া 'স্ববিরোধিতা' তো আমাদের দেশে উনিশ-বিশ শতকের চিন্তানায়কদের মধ্যেও ছিল, আজও বর্তমান। তার ব্যতিক্রম নন বিনয় ঘোষও। আর একথা অবিতর্কিত সত্য, লেখকের সৃজনী-সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখে তো মনের এই দোলাচলতা বা চিন্তার সংকটই।

চিঠির বাক্সো

আরেক রকম, ১-১৫ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রহসন নিয়ে যে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে তা আমাকে চমকে দিয়েছে, দুটি কারণে। প্রথমত, বিজেপি-কে গদিচ্যুত করার জন্য যে-কোনো রাজনৈতিক সমন্বয়কে আমাদের স্বাগত জানানো উচিত বলে আমার মনে হয়। তাই শিবসেনাকে কংগ্রেস সমর্থন করছে এতে আমি আপত্তি করার খুব বেশি কিছু প্রাথমিকভাবে দেখিনি। অন্যদিকে, সম্পাদকীয়তে সঠিকভাবেই বিজেপি-র অন্যায়ভাবে রাতের অন্ধকারে ক্ষমতা চুরি করাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। আমার সঙ্গে মতের অমিল থাকলেও সম্পাদকীয়টিকে প্রশংসা করতে আমি বাধ্য হচ্ছি কারণ, প্রথাগত রাজনৈতিক বিশ্লেষণের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে আপনারা এই আকালেও রাজনৈতিক শুদ্ধির সন্ধান করে চলেছেন। আপনাদের এই অন্বেষণকে একদিকে সাধুবাদ জানাতেই হবে, অন্যদিকে এই শুদ্ধতার খোঁজ যে বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলি করতে অপারগ তাও মেনে নিতে হবে। বিশেষ করে শিবসেনার মতন একটি হিন্দুত্ববাদী দল যদি হঠাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার ভেক ধরে তাতেই যে তাদের পাপ ধুয়ে যায় না, তা সোচ্চারে বলার জন্য আপনাদের সাধুবাদ জানাতেই হবে। কিন্তু আবার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য বিজেপিকে গদিচ্যুত করার জন্য শিবসেনার সঙ্গেও যে হাত মেলানো যায়, তা নিয়ে অন্তত আমার মনে কোনো সংশয় নেই।

একই সংখ্যায় অনুরাধা রায় এবং অরুণ সোমের প্রবন্ধ দুটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। বিদ্যাসাগর এবং বাঙালি সমাজের দ্বন্দ্ব, বিদ্যাসাগরকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের বাইরে এনে এক যুগপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবু, ইতিহাস পাঠের পথ ধরে গুরুতর প্রশ্ন উঠবেই যে তা হলে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমরা ব্যক্তির ভূমিকাকে কোন চোখে দেখব? ইতিহাস কি শুধু যুগপুরুষদের সম্মিলিত প্রয়াসের ফসল, নাকি ইতিহাস ও ব্যক্তির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে? উত্তরটি আমাদের জানা। তবু, অনুরাধাদেবীর মতন ইতিহাসবিদ যদি *আরেক রকম*-এর পাতায় এই নিয়ে আরো কিছু লেখেন, আমরা সমৃদ্ধ হই।

অরুণবাবুর লেখায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের যে প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান আমরা পাচ্ছি, তার গুরুত্ব অসীম। এমন অভিজ্ঞতা আর কজনেরই-বা রয়েছে? আমি তাই চাই 'অপ্রকাশিত রাশিয়ার ডায়রি' আরো প্রকাশিত হোক।

বিপ্লব আচার্য
কলকাতা

পুনঃপাঠ

মার্কসীয় দর্শনে শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা

সুকোমল সেন

বিশ্বে শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা

মানব সমাজের অগ্রগতির ইতিহাসে একদল মানুষ গোড়া থেকেই সমাজের নীচের তলায় থেকে পরিশ্রম করে সম্পদ উৎপাদন করছে যদিও সেই সম্পদ ভোগ করেছে আরেকদল মানুষ। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে কখনও ক্রীতদাসরূপে কখনও বা ভূমিদাসরূপে এই নীচের তলার মানুষেরা নিষ্পেষিত হয়েছে। মানব ইতিহাসের আরো অগ্রগতিতে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যুদয়। শ্রমিকশ্রেণী জন্মলাভ করেছে এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্য থেকেই। এই নতুন সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমের ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে অফুরন্ত সম্পদ যার মালিক শ্রমিকশ্রেণী নয়—অন্য একদল মানুষ—পুঁজিবাদী শ্রেণী, যাঁদের সঙ্গে উৎপাদনের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই।

এটাই শ্রেণী বিভক্ত সমাজের দ্বন্দ্ব। শ্রমজীবী মানুষ যারা উৎপাদন করে—আর যারা সেই উৎপাদনের মালিকানা লাভ করে এই দুই এর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই মানব সমাজের অগ্রগতি। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে এই পরস্পর বিরোধী দুই শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও পুঁজিবাদী শ্রেণী। পুঁজিবাদী শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তাই শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস। ভারতবর্ষেও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনার পর থেকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে যে সংগ্রাম আজও অব্যাহত।

কিন্তু ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রামের সূচনা কবে এবং কিভাবে হয়েছিল এই প্রশ্নটির গুরুত্ব ঐতিহাসিক। সেই প্রশ্ন আলোচনা করতে গেলে প্রথম আলোচনা করতে হয় ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনা কবে থেকে হয়েছিল। ইউরোপে যখন শিল্প-বিপ্লব ঘটে এবং যে শিল্প-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পশ্চিমী দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং তা ক্রমোন্নতি লাভ করেছিল ভারতে সেইসময় শিল্প-বিপ্লব ঘটবার কোন সুযোগ ঘটেনি এবং ফলে ভারতীয় সমাজে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও পত্তন সেই সময় ঘটেনি।

ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইংলণ্ডেই শিল্প-বিপ্লব প্রথম ঘটে। তার কারণ মূলতঃ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, ইংলণ্ডেই প্রথম সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়াশ্রেণী বিজয়ী হয়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ভেঙে পড়ে এবং ধনতন্ত্র প্রসারের পথ বাধামুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ধনতন্ত্র প্রসারের জন্য যে পুঁজির প্রয়োজন তাও বৃহত্তম ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণী প্রধানতঃ ভারত এবং অন্যান্য উপনিবেশগুলিকে শোষণের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতের ধনসম্পদ জলস্রোতের মত ইংলণ্ডকে প্লাবিত করেছিল।

আর ঠিক এই সময়েই একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শিল্পবিপ্লবের সূচনা ঘটালো। ১৭৬৪ সালে আবিষ্কৃত হল হারগ্রীভসের স্পিনিংজেনী, ১৭৬৫ সালে ওয়াট্সের স্টীম এঞ্জিন, ১৭৬৯-এ আর্করাইটের জলশক্তি চালিত চাকা, ১৭৮৫-তে কাটরাইটের যন্ত্রচালিত তাঁত এবং আরও বিভিন্ন রকম আবিষ্কার শিল্প-বিপ্লবের কারিগরি ভিত্তি স্থাপন করল। এই আবিষ্কার এবং তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে সংগৃহীত ধনসম্পদের যোগাযোগে ইংলণ্ডে স্থাপিত হল কলকারখানা; ব্যক্তিগত কায়িক শ্রম-নির্ভর কারিগরের পরিবর্তে সৃষ্টি হল যন্ত্রচালিত কারখানা শ্রমিক। শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতির প্রয়োগই এই বিপ্লবের একমাত্র তাৎপর্য নয়—এই বিপ্লবের আরেকটি তাৎপর্য হচ্ছে দুটি মৌলিক সামাজিক শ্রেণীর সৃষ্টি—একটি বুর্জোয়া শ্রেণী যারা কলকারখানা ও উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিকানা লাভ করল এবং শ্রমিকদের শোষণ করতে শুরু করল—অপরটি সর্বহারা অর্থাৎ মজুরি-শ্রমিক যারা উৎপাদন করল অথচ উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা লাভ করল না।

এই শিল্প-বিপ্লব একশত বৎসর ধরে চলেছিল। ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তখন ধনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু ধনতন্ত্রের এই অগ্রগতির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর আর্থিক বা সামাজিক উন্নতি ঘটল না। তাঁদের অবস্থা ক্রমাগত অসহনীয় হয়ে উঠল। ফলে দেখা দিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলন ইতিহাসের আরেক দিক নির্দেশ করল— ধনতন্ত্রও কোন স্থায়ী সমাজব্যবস্থা নয়। ধনতন্ত্রের মধ্য দিয়েই জন্মলাভ করেছে যে সর্বহারাশ্রেণী আগামী দিনে পুঁজিবাদীশ্রেণীর শক্তিকে এরাই চ্যালেঞ্জ জানাবে। ১৮৩০ থেকে ১৮৫০-এর চার্টিস্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইংলণ্ডে শ্রমিকশ্রেণী যে সংগঠিত, ব্যাপক, গণভিত্তিক এবং স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিত সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন তা ছিল আগামীদিনের বার্তাবহ।

ইংলণ্ডে এই সময়ে শুধুমাত্র শিল্পের প্রসার নয় এমনকি শিল্পের সংকটও শুরু হয়েছে। এবং সেই সংকটজনিত অবস্থায় কলকারখানার শ্রমিকদের উপর পুঁজিপতিদের শোষণও তীব্রতর রূপ ধারণ করল। শ্রমিকশ্রেণীও তার জন্মমূহূর্ত থেকেই এই শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ইংলণ্ডের এই শ্রমিক আন্দোলন মোটামুটি শুরু হয় ১৭৫২ সাল থেকে।[১] প্রথম যুগের শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলি ছিল মূলতঃ দক্ষ শ্রমিকদের কতকগুলি সংঘ। সেই সময় শ্রমিকদের এই সংঘবদ্ধতার বিরুদ্ধে এমন ধরনের হিংস্র আইনকানুন ছিল যে শ্রমিকদের এই সংঘগুলিকে বে-আইনীভাবে কাজ করতে হত। ১৮২৪ সালে এই জঘন্য আইনগুলির আংশিক পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে এই শ্রমিক ইউনিয়নগুলি কিছু কিছু প্রকাশ্য কাজকর্ম করতে সমর্থ হয়। আন্দোলন আরেকটু অগ্রসর হলে ১৮৩০ সালে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য জাতীয় সমিতি বা ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেকশন অব লেবার গঠিত হয়। ১৮৩৩-৩৪ সালে যে 'গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কনসলিডেটেড ট্রেড ইউনিয়ন' গঠিত হয়, এই সংগঠন ছিল তারই অগ্রদূত। শেষোক্ত সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৫,০০,০০০।[২]

১৮৩৭ সালে ইংলণ্ডে 'লণ্ডন ওয়ার্কিংমেনস্ এসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে মহান চার্টিষ্ট আন্দোলন শুরু হল। চার্টিষ্ট আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের একটা গণভিত্তিক এবং সচেতন রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ইংলণ্ডে এই সময় শিল্পের সংকট তীব্রতর রূপ ধারণ করে। ফলে শুরু হয় গভীর অর্থনৈতিক সংকট যার বোঝা বহন করতে হয় শ্রমিকদেরই। শ্রমিকেরা তাই পার্লামেন্টের কাছে শ্রমিকদের ৬—দফা রাজনৈতিক অধিকার দাবি করে গণ-দরখাস্ত পেশের কর্মসূচী গ্রহণ করল। কয়েকবার তারা এই গণ-দরখাস্ত পেশ করল। একটি দরখাস্তে তারা ৫০,০০,০০০ স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল। দশ বৎসর ধরে এই আন্দোলন চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের সেই সময়কার সাংগঠনিক ও আন্দোলন সম্পর্কিত অনভিজ্ঞতার জন্য চার্টিষ্ট-আন্দোলন পরিপূর্ণ সফল হতে পারেনি।

কিন্তু চার্টিষ্ট আন্দোলনের দুর্বলতা সত্ত্বেও বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনে এর প্রভাব ছিল অসামান্য। ইংলণ্ডের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই আন্দোলনের চাপে শাসকশ্রেণী শ্রমিকদের কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছিল। ১৮৪৭ সালে নারী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের জন্য দিনে ১০ ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম প্রচলন করাতে চার্টিষ্টরা সমর্থ হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকদের জন্যও ১০-ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম প্রচলিত হয়েছিল।

লেনিন এই আন্দোলন সম্পর্কে বলেছিলেন, 'ইংলণ্ড বিশ্বকে শ্রমিকশ্রেণীর সর্বপ্রথম সত্যিকারের ব্যাপক গণভিত্তিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছ সর্বহারা বৈপ্লবিক আন্দোলন উপহার দিয়েছে।'[৩]

এই সময় ইউরোপের অন্যান্য দেশেও শ্রমিক ইউনিয়নবিরোধী বিভিন্নরূপ হিংস্র আইনকানুন চালু ছিল। ফলে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, জার্ম্মানী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে অল্পসংখ্যক শ্রমিক ইউনিয়নই অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। শ্রমিকদের সংগঠনগুলি গোপন কায়দায় কাজকর্ম চালাতে বাধ্য হয়েছিল। কেবলমাত্র সমবায় সমিতি ইত্যাদি নামে কিছু সংগঠনের প্রকাশ্যে কাজ করার অধিকার ছিল।

আমেরিকাতে নিগ্রোরা সেই সময়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। নিগ্রোদের বাধ্য করা হত এক বর্বর জীবনযাপনে। অথচ ঠিক একই সময়ে শ্বেতকায় শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছিল অধিকতর গণতান্ত্রিক অধিকার। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকায় শ্বেতকায় শ্রমিকদের কতকগুলি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে এবং অনেকগুলি ধর্মঘট পরিচালিত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকদের এই সমস্ত আন্দোলনগুলিই ছিল ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেমন কোন একটা বিশেষ দেশে আবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে এবং একটা আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল, ঠিক তেমনি শ্রমিক আন্দোলনও কোন একটা দেশে আবদ্ধ থাকেনি। ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন দেশে। শ্রমিক আন্দোলন তাই মূলতঃ আন্তর্জাতিক। শিল্প, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন বিশেষ দেশের গণ্ডী অতিক্রম করেছে তেমনি শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-চেতনা দেশসমূহের গণ্ডী অতিক্রম করে রূপ নিয়েছে আন্তর্জাতিক।

শ্রমিকদের এই আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ থেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে গড়ে উঠে কতকগুলি শ্রমিক সংগঠন যেগুলির চরিত্র ছিল মূলতঃ আন্তর্জাতিক। চার্টিষ্ট আন্দোলনে ছিল সুস্পষ্ট আন্তর্জাতিক মনোভাব। সমসাময়িক 'দি একজাইলস লীগ' (১৮৩৪-৩৬), 'ফেডারেশন অব দি জাষ্ট' (১৮৩৬-৩১) এবং 'কমিউনিস্ট লীগ' (১৮৪৭-৫২) এর চরিত্র ছিল নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক। সদস্যপদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও ছিল এগুলি সর্বহারার শ্রেণী সংগঠন।

শ্রমিক সংগঠনের এই ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়েই গঠিত হয়েছিল ১৮৬৪ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস্ এসোসিয়েশন। লণ্ডনের সেন্ট মার্টিন হলে ২৮শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের শ্রমিক প্রতিনিধিদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই সংগঠন জন্মলাভ করেছিল। কার্লমার্কস স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে। এই সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল 'শ্রমিকশ্রেণীকে নিজের মুক্তি নিজেকেই অর্জন করতে হবে; একটা শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও একাধিপত্যই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য নয়। এই সংগ্রামের লক্ষ্য হচ্ছে সমান অধিকার ও দায়িত্ব এবং শ্রেণী শাসনের অবসান।'[৪] 'দুনিয়ার মজুর এক হও'—এই সংগ্রামী স্লোগানের মধ্যে দিয়ে এই সম্মেলনের কাজ শেষ হয়।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দর্শন

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে শ্রমিক আন্দোলন প্রসার লাভ করছে সেই সময় অর্থনৈতিক দাবির পাশাপাশি শ্রমিকদের বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক তত্ত্বেরও উদ্ভব হল। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হল সাম্যবাদ। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বাহারাদের নিরন্তর শ্রেণী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতেই সাম্যবাদী দর্শনের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ। ধনতন্ত্রের অভ্যুদয় ও তার অগ্রগতি শ্রমিকদের জন্য নিয়ে এসেছিল অশেষ দুঃখকষ্ট। শ্রমিকরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য অনেক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই সংগ্রামগুলিতে শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় শ্রেণী-চেতনা ও সাংগঠনিক বোধের প্রচণ্ড অভাব অনুভূত হয়েছিল।

শ্রমিকদের বিদ্রোহের প্রথমযুগ যখন শ্রমিকরা নতুন যন্ত্রগুলিকেই তাদের শোষণের মূল কারণ মনে করে যন্ত্রগুলিকেই ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছিল তখন তারা ঠিক বুঝতে পারেনি শোষণের মূল কারণগুলিকে। তখন তাদের যন্ত্র-ভাঙ্গার কাজ ছিল নিতান্তই সামগ্রিক উত্তেজনার ফলশ্রুতি। ১৮৩১ সালে ফ্রান্সের অন্যতম বৃহৎ শিল্পাঞ্চল লিয়ঁস-এ শ্রমিকরা বিদ্রোহ করে দশ দিন যাবৎ কারখানাকে তাদের পরিপূর্ণ দখলে রেখেছিল। কিন্তু তখনও তারা জানত না যে এর পরবর্তী কর্তব্য তাদের কি হবে, তখন তারা, সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি তাদের বিদ্রোহের লক্ষ্য কি? সবচেয়ে বড় কথা হল সেই সময় এমন কোন রাজনৈতিক দল ছিল না যে দল তাদের সংগঠিত করতে এবং বিজয়ের পথে নিয়ে যেতে পারত। সেই জন্যেই যে বিদ্রোহগুলি এত সফলভাবে শুরু হয়েছিল সেইগুলির পরিসমাপ্তি ঘটেছিল পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। ১৮৩০-৩২ সালে ইংলণ্ডের ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন সমগ্র ইউরোপে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। রাজতন্ত্রী পার্লামেন্টের কাছে শ্রমিকরাই দাবি পেশ করেছিল গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য। কিন্তু শ্রমিকদের এই সংগ্রামের যে সাফল্য ঘটেছিল তার ফলভোগ করেছিল বুর্জোয়ারাই। শ্রমিকদের অসংগঠিত অবস্থা এবং প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক চেতনার অভাবই ছিল এর কারণ। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কারণবশতঃ শাসকশ্রেণী চার্টিস্ট আন্দোলনকেও দমন করতে সমর্থ হয়েছিল, যদিও চার্টিস্ট আন্দোলন তুলনামূলকভাবে অনেকটা পরিপক্ক শ্রমিক আন্দোলন হিসাবে গড়ে উঠতে পেরেছিল। সমস্ত পশ্চিম ইউরোপে আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেলেও জনগণ বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর দুর্ভোগের কোন অবসান হল না।

মার্কস ও এঙ্গেলসের পূর্বে কিছু ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রী শোষণের নিন্দা করেছেন এবং ঘৃণার সঙ্গে ধনতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক সংকটের উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা এর সমাধানে শ্রেণী-সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণীসহযোগিতার প্রচার করেছিলেন।

সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার উৎপত্তির এই সময় সমাজতন্ত্র এবং শ্রমিক আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে দুটো পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন প্রবাহ হিসাবেই এগিয়ে চলেছিল। ইউটোপীয়ান সোশ্যালিস্টদের পক্ষে শ্রমিক আন্দোলনে শ্রেণী-সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। এর জন্য প্রয়োজন ছিল ইতিহাসের নিয়মকে হৃদয়ঙ্গম ও অনুধাবন করা। এই কাজ তখনও অসম্পূর্ণ ছিল।

এই কাজ সমাধা করলেন কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস্। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে' মার্কস ও এঙ্গেলস্ শ্রমিকশ্রেণীর কাছে কর্তব্য নির্ধারণ করে দিলেন। ম্যানিফেস্টোতে তাঁরা বললেন, ইতিহাস মূলতঃ নির্ধারিত হয় উৎপাদনের অগ্রগতির দ্বারা। সমাজের নিম্নতম রূপ থেকে ইতিহাস যাত্রা শুরু করেছে এক উন্নততর রূপের দিকে এবং এই উন্নততর রূপের তাৎপর্য হচ্ছে সেই সমাজের উন্নততর উৎপাদিকা শক্তি। এই প্রক্রিয়ার ফলেই যে দাস-সমাজে দাস-মালিকেরা দাসদের শোষণ করত সেই দাস-সমাজ থেকে

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে উত্তরণ। এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ভূমিদাসরা নির্যাতিত ও শোষিত হত জমির মালিকদের দ্বারা। আবার এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তন ঘটে সৃষ্টি হল ধনতান্ত্রিক সমাজ, যে সমাজে পুঁজিবাদীদের উন্নতি নির্ভর করল শ্রমিকদের শোষণের উপর। অনুরূপভাবে এই ধনতান্ত্রিক সমাজ চিরস্থায়ী হবে না—সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক সমাজকে স্থানচ্যুত করবে।

এই পরস্পর বিরোধী শ্রেণীসমন্বিত এক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সংঘটিত হয় এই পরস্পর বিরোধী শ্রেণীদুটির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং এই সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠে বিপ্লবের মুহূর্তে।

শ্রেণী কি? মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রেণী হচ্ছে জনগণের একটা সমষ্টি এবং এই জনসমষ্টি উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক কি মালিক নয় এবং সেই উৎপাদনের উপায়ের ধরনটা কি তার উপরই নির্ভর করে সেই সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর চরিত্র। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণী এবং এর বিরোধী শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী—এই শ্রমিকশ্রেণীর হাতে উৎপাদনের উপাদানসমূহের কোন মালিকানা নেই এবং এরা শোষিত হয় উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা।

এই পরস্পর বিরোধী শ্রেণীসমন্বিত সমাজে এই শ্রেণীগুলি নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত এবং এই শ্রেণী-সংগ্রামই সৃষ্টি করে ইতিহাস। শোষিত জনগণ তার মুক্তির জন্য শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করে সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলে ইতিহাস। মার্কস ও এঙ্গেলস্ এখানেই শেষ করলেন না। তাঁরা এ কথাও ঘোষণা করলেন যে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের দ্বারা শ্রমিকশ্রেণী বিজয়লাভ করবে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে এবং এক নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে যে সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা থাকবে সমগ্র সমাজে থাকবে না কোন শোষণ। এই নতুন সমাজব্যবস্থাই হল সমাজতন্ত্র।

ম্যানিফেস্টোতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আহ্বান দেওয়া হয়েছে—'দুনিয়ার মজুর এক হও'। এই আহ্বানের অর্থ কি? ধনতান্ত্রিক শোষণ কোন একটা বিশেষ দেশের ব্যবস্থা নয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা যার শোষণের ক্ষেত্রও আন্তর্জাতিক। তাই শ্রমিক আন্দোলনকেও চূড়ান্তভাবে ধনতন্ত্রের মোকাবিলা করতে হলে সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকদের তা একযোগে এবং ঐক্যবদ্ধভাবেই করতে হবে। এখানেই শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের উৎস। বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের এই দুনিয়া-জোড়া প্রতিরোধের পাশাপাশি নিজনিজ দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সর্বহারাশ্রেণীই পুঁজিবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, তাই তাকে নিজ দেশে স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্যও সর্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধার ভূমিকা পালন করতে হবে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী ভূমিকাই সংশ্লিষ্ট দেশের এবং সারা পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারক। নিজ দেশকে এবং সারা জগৎকে পরিবর্তনের ও শোষণবিহীন, সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণীর উপর অর্পিত। মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিনের বিপ্লবী দর্শনের এই মূল শিক্ষার নিরিখেই বিচার্য বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশ।

সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামে ট্রেড ইউনিয়ন

ট্রেড ইউনিয়ন কি? কার্ল মার্কস ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ শ্রমিকদের সংগঠিত করবার কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করেছেন। শ্রমিকদের যে শক্তি বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তাকে সংহত করে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়াই মূলতঃ ট্রেড ইউনিয়নগুলির উদ্দেশ্য। মার্কস লক্ষ্য করেছিলেন, যে বিচ্ছিন্ন শ্রমিকরা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রত তারা ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছে এবং যুক্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী পুঁজি হচ্ছে কেন্দ্রীভূত সামাজিক শক্তি, 'কনসেনট্রেটেড সোশাল পাওয়ার'। কিন্তু শ্রমিকের শক্তি হচ্ছে একমাত্র তার নিজস্ব শ্রম-শক্তি। কাজেই পুঁজির মালিক ও শ্রমের মালিকের মধ্যে যে চুক্তি হয় সেই চুক্তি কখনই ন্যায্য সর্তের ভিত্তিতে হতে পারে না। শ্রমিকরা একমাত্র যে সামাজিক শক্তির অধিকারী তা হচ্ছে তাদের সংখ্যাগত শক্তি। কিন্তু শ্রমিকদের অনৈক্যের জন্য এই সংখ্যাগত শক্তিও অকেজো হয়ে পড়ে। শ্রমিকদের মধ্যে এই অনৈক্যের কারণ তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং তাঁদের এই আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতাই তাঁদের অনৈক্যকে জীইয়ে রাখে। প্রথমযুগে ট্রেড ইউনিয়নের উদ্ভব হয়েছিল এই প্রতিযোগিতাকে দূর করবার অথবা অন্ততঃ কিছুটা সীমাবদ্ধ করবার একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা হিসাবে এবং এর মধ্য দিয়ে এমন একটা চুক্তিবদ্ধ অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছিল যাতে করে শ্রমিকরা দাসত্বের পরিস্থিতি থেকে অন্ততঃ কিছুটা উপরে উঠতে পারে।

তাই, ট্রেড ইউনিয়নগুলির আশু লক্ষ্য পুঁজির বিরুদ্ধে দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল যাতে করে পুঁজির আক্রমণকে কিছুটা ঠেকানো যায়। মজুরী বৃদ্ধি এবং কাজের সময় কমিয়ে আনাই ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের এই সংগ্রামগুলির মূল প্রশ্ন।

এভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাদের অজান্তেই শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করবার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবেই গড়ে উঠেছিল। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করছিল ট্রেড ইউনিয়নগুলি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মজুরি-দাসত্বের ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর মতো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্যই শ্রমিকদের সংগঠিত কেন্দ্র হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি উন্নীত হয়ে উঠছিল। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মার্কস ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে অরাজনৈতিক বা নিরপেক্ষ হিসাবে বিবেচনা করেননি বরং তিনি ট্রেড ইউনিয়নের উপর অসীম রাজনৈতিক তাৎপর্য আরোপ করেছেন।

১৮৬৬ সালে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেন্স এ্যাসোসিয়েশনের জেনেভা কংগ্রেসের প্রস্তাবে শ্রমিক আন্দোলনের সমসাময়িক অবস্থার পর্যালোচনায় এই তাৎপর্যকেই তুলে ধরা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে,

'ট্রেড ইউনিয়নগুলি এ যাবৎ তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে একমাত্র পুঁজির বিরুদ্ধে স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পরিচালনার জন্যই, ট্রেড ইউনিয়নগুলি এখনও মজুরি-দাসত্বের ব্যবস্থা ও বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতিকে আক্রমণ করবার তার যে শক্তি আছে সেই শক্তিকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি। সেইজন্যই তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি থেকে দূরে থেকেছে। কিন্তু তাহলেও সম্প্রতি তারা স্পষ্টতই জেগে উঠছে এবং তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্বকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ইংলণ্ডের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আন্দোলনে ট্রেড ইউনিয়নগুলির অংশগ্রহণ এবং যুক্তরাষ্ট্রে তাদের কাজকর্মের উন্নততর ধ্যান-ধারণা.....[৫] এর মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।' কিন্তু মার্কস শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়নগুলির অতীত এবং বর্তমান দায়িত্ব সম্পর্কেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। ঐ প্রস্তাবেই ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ

'তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এখন অবশ্যই শিখতে হবে যে কিভাবে পরিপূর্ণ মুক্তির বৃহত্তর স্বার্থে শ্রমিকদের সংগঠিত করবার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে সচেতনভাবে কাজ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত প্রতিটি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকেই তাদের সমর্থন করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বুঝতে হবে যে তারাই হচ্ছে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি এবং তাদের স্বার্থের রক্ষক; এই উপলব্ধি থেকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে সমস্ত বিচ্ছিন্ন শ্রমিককেই ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে সংগঠিত করা যায়। যে সমস্ত শিল্পে শ্রমিকরা সবচেয়ে কম মজুরি পায় সেখানে শ্রমিকদের স্বার্থ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের কথা বলা যেতে পারে। একটা বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার জন্য এই শ্রমিকরা প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। ট্রেড ইউনিয়নগুলির দায়িত্ব সমস্ত জগৎকে বোঝানো যে তাদের সংগ্রাম কোনো সংকীর্ণ আত্মস্বার্থে নয়, বরং বিপরীতভাবে সমগ্র নিষ্পেষিত জনগণের মুক্তিই তাদের সংগ্রামের লক্ষ্য।'[৬]

এই প্রসঙ্গে প্রথম আন্তর্জাতিক নিরন্তর বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে শ্রমিক-শ্রেণীর অর্থনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সেকালে তথাকথিত পণ্ডিতরা সর্বদাই প্রচেষ্টা চালিয়েছে রাজনীতি ও অর্থনীতিকে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। এদের আসল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকশ্রেণীকে কেবলমাত্র অর্থনীতির মধ্যে আবদ্ধ রেখে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা। কার্ল মার্কস এই সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্কটিকে অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করলেন। মার্কস লিখলেন,

'স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন। এর জন্য শ্রমিকশ্রেণীর আগে থাকতেই একটা সংগঠন থাকা প্রয়োজন। এই সংগঠনটা কিছুটা উন্নতস্তরেরও হবে এবং এটা গড়ে উঠবে অর্থনৈতিক শক্তিগুলির মধ্য থেকেই।'

'কিন্তু অপরপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন যার মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী শ্রেণী হিসাবে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয় এবং ''বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টি করে'' শাসকশ্রেণীর মাথা নোয়াতে চেষ্টা করে তার প্রতিটিই হচ্ছে ''রাজনৈতিক আন্দোলন''। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে একটা কারখানা বা একটা শিল্পে একজন পুঁজিপতির কাছ থেকে ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে যদি জোর করে কাজের সময় কমিয়ে আনা যায় তবে সেটা হবে একটা নিছক অর্থনৈতিক আন্দোলন। অপরপক্ষে যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জোর করে আট ঘণ্টা কাজের বিধি ইত্যাদি প্রণয়ন করা যায় তা হবে রাজনৈতিক আন্দোলন।

'এবং এভাবেই সর্বত্র শ্রমিকদের খণ্ড খণ্ড অর্থনৈতিক আন্দোলনগুলি থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভব হয়। এই রাজনৈতিক আন্দোলনটা হচ্ছে সাধারণ পদ্ধতিতে আপন লক্ষ্য সাধনের জন্য একটা শ্রেণীর আন্দোলন। আবার সাধারণ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনের এই পদ্ধতিটার মধ্যে একটা জোর করে আদায় করে নেবার মত শক্তিও আছে।......'[৭]

ইতিহাসের এমনই নিয়ম যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং তাদের সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন শুধু যে প্রয়োজনের তাগিদেই

গড়ে উঠে তা নয়, এটা ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্যও বটে। লেনিনের কথায়, 'ট্রেড ইউনিয়নগুলি যে, শুধুমাত্র ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজন তাই নয়, শিল্প-শ্রমিকদের সংগঠন হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ঐতিহাসিকভাবেও অনিবার্য......।'[৮]

ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য এই ট্রেড ইউনিয়নগুলি কিভাবে গড়ে উঠে, শ্রমিকরা কিভাবে শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হয় এবং শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন সংগ্রামগুলি কিভাবে দেশব্যাপী শ্রেণী-সংগ্রামে উন্নীত হয় কার্ল মার্কস তা আরো প্রাঞ্জলভাবে অন্যত্র ব্যাখ্যা করছেন। মার্কস বলছেন, 'বিকাশের বিভিন্নস্তর অতিক্রম করে সর্বহারাকে এগিয়ে যেতে হয়' জন্মলগ্ন থেকেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম শুরু হয়। প্রথমে শ্রমিকরা এককভাবে এই সংগ্রাম চালায়, তারপর একটা কারখানার শ্রমিকরা একযোগে এই সংগ্রাম পরিচালনা করে। তারপর সংগ্রাম পরিচালিত হয় স্থানীয়ভাবে কোন একটা শিল্পের শ্রমিকদের দ্বারা, প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকদের শোষণ করে এমন বিশেষ বুর্জোয়ার বিরুদ্ধেই এই সংগ্রামগুলি পরিচালিত হয়। শ্রমিকরা বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতিকে আক্রমণ করেনি, আক্রমণ চালিয়েছিল উৎপাদনের যন্ত্রের বিরুদ্ধে; যে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতিগুলি ছিল তাদের শ্রমের প্রতিদ্বন্দ্বী সেগুলিকে তারা বিনষ্ট করেছিল, যন্ত্রগুলোকে তারা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছিল, কারখানাগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা তারা মধ্যযুগের কারিগরদের বিলুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিল।

এই স্তরে শ্রমিকরা তখনও অসংগঠিত জনতা হিসাবেই রয়েছে। সারা দেশে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থেকে এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে তারা তখনও বিভক্ত...

'কিন্তু শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারাদের সংখ্যাগত বৃদ্ধিই হয় না, এরা আরও ব্যাপকতরভাবে কেন্দ্রীভূত হয়, এদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং এরা এই শক্তিকে আরও বেশী করে অনুভব করে।......একজন একক শ্রমিকের সঙ্গে একজন একক বুর্জোয়ার সংগ্রাম আরো বেশি বেশি করে দুটি শ্রেণীর সংগ্রামের চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। তারপরই শ্রমিকরা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে জোট-বাঁধা শুরু করে। মজুরির হারকে বৃদ্ধি করার জন্য তারা একসঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। প্রায়শঃই যে বিদ্রোহগুলি ফেটে পড়ছে সেগুলির জন্য পূর্বাহ্নেই ব্যবস্থাদি করার লক্ষ্য নিয়ে তারা স্থায়ী সমিতি গঠন করে। এই সংগ্রাম ইতস্ততঃ দাঙ্গাহাঙ্গামার রূপে ফেটে পড়ে।

'কখনও কখনও শ্রমিকরা বিজয়ী হয়, কিন্তু তা কেবলমাত্র সাময়িকভাবে। তাৎক্ষণিক ফলাফল নয়, শ্রমিকদের ক্রমসম্প্রসারণশীল জোটবদ্ধতাই হচ্ছে তাঁদের সংগ্রামের প্রকৃত ফলশ্রুতি। আধুনিক শিল্পের ফলে যে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয় তার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের এই জোটবদ্ধতা আরও সহায়তা পায় এবং এক অঞ্চলের শ্রমিকের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের শ্রমিকের সংযোগ ঘটায়। একই চরিত্রের অসংখ্য স্থানীয় সংগ্রামগুলিকে দেশব্যাপী দুটো শ্রেণীর সংগ্রাম হিসাবে কেন্দ্রীভূত করার জন্য ঠিক এই সংযোগেরই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রতিটি শ্রেণী সংগ্রামই হচ্ছে রাজনৈতিক সংগ্রাম'।[৯]

ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে এই শ্রেণী-সংগ্রাম কলে কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস্ উভয়ই ধর্মঘটকে শ্রমিকশ্রেণীর তাৎক্ষণিক ও অন্তিম লক্ষ্য সাধনের একটা শক্তিশালী সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এঙ্গেলস্ ধর্মঘটকে বিবেচনা করতেন 'স্কুল অব ওয়ার' হিসাবে। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামে তিনি ধর্মঘটকে মনে করতেন একটা অত্যাবশ্যক এবং বাধ্যতামূলক অস্ত্র। ধর্মঘটের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে যেয়ে এঙ্গেলস্ বলছেনঃ

'যুদ্ধে একপক্ষের ক্ষতি অপরপক্ষের লাভস্বরূপ। শ্রমিকশ্রেণী মালিকদের সঙ্গে রয়েছে একটা যুদ্ধাবস্থার মধ্যে,......'

'যে অবিশ্বাস্য হারে ধর্মঘটগুলি সংঘটিত হচ্ছে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে কি ব্যাপকভাবে ইংলণ্ডে সামাজিক যুদ্ধ ফেটে পড়ছে।'

এই ধর্মঘটগুলি প্রথমে খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষের রূপে শুরু হয়ে—অনেক সময়ে অত্যন্ত জোরদার লড়াই-এ পরিণত হয়। এটা সত্য যে এই সংগ্রামগুলির মধ্য দিয়ে কিছু নির্ধারিত হয় না কিন্তু এগুলি হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ যে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারার চূড়ান্ত সংগ্রাম আসন্ন। এগুলি হচ্ছে শ্রমিকদের ''যুদ্ধ শেখার স্কুল'' এবং এর মধ্য দিয়েই তারা অনিবার্য সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। ধর্মঘটগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পের বিভিন্ন শাখাগুলি ঘোষণা করে যে তারাও শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হয়েছে'।[১০] তারপর শ্রমিকদের ইউনিয়নে সংগঠিত হওয়া এবং ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার কথা আলোচনা করতে যেয়ে লেনিন আরও মন্তব্য করলেন, লড়াই শেখবার ক্ষেত্র হিসাবে এই ইউনিয়নগুলির ভূমিকা অপূর্ব'।[১১]

এঙ্গেলস্ ধর্মঘটকে এভাবে সামাজিক যুদ্ধের একটা ধরন হিসাবেই গুরুত্ব দিয়েছেন। লড়াই শেখবার জন্য ধর্মঘটকে তিনি অনিবার্য মনে করতেন। মার্কসও এইভাবে ধর্মঘট সংগ্রামের প্রতি এবং শ্রমিকদের সংহতিমূলক কার্যকলাপের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পরবর্তীকালে লেনিন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, রুশিয়া এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে সংঘটিত ধর্মঘটগুলির শিক্ষাকে অনুধাবন করে তাঁর 'ধর্মঘট প্রসঙ্গে' নিবন্ধে ধর্মঘটগুলির তাৎপর্য অতি সুচারুভাবে তুলে ধরেন। লেনিন লিখেছেন ঃ

'শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ক্ষেত্রে ধর্মঘটগুলির অথবা কাজ বন্ধের তাৎপর্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ধর্মঘটগুলিকে একটা পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিতে দেখা দরকার। আমরা দেখেছি, মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে একটি চুক্তির মধ্য দিয়েই মজুরি নির্ধারিত হয়। এই অবস্থায় একজন শ্রমিক যখন নিজেকে এককভাবে অত্যন্ত অসহায় মনে করে তখন শ্রমিকদের পক্ষে যুক্তভাবে সংগ্রাম করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। মালিক যাতে মজুরি হ্রাস করতে না পারে অথবা যাতে মজুরি বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে বাধ্য হন। এবং এটা ঘটনা যে প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশেই এবং সর্বক্ষেত্রেই শ্রমিকরা নিজেদের অসহায় মনে করে যখন তারা বিচ্ছিন্ন থাকে। একমাত্র ঐক্যবদ্ধভাবেই তারা মালিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে—হয় ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে অথবা ধর্মঘটের হুমকী প্রদর্শন করে। ধনতন্ত্রের অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় যখন অধিক সংখ্যায় বড় বড় কারখানা চালু হয় এবং বড় মালিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ছোট মালিকরা দ্রুত কোনঠাসা হয়ে পড়ে, তখন শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগত জরুরী আকার ধারণ করে, কারণ এই অবস্থায় বেকারী বৃদ্ধি পায়, পুঁজিপতিদের মধ্যে সস্তায় উৎপাদনের (এবং সস্তায় উৎপাদনের জন্য তারা শ্রমিকদের মজুরি যথাসম্ভব কমিয়ে দেয়) প্রতিযোগিতা তীব্র হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের ওঠানামা শুরু হয় ও সংকট তীব্র হয়। যখন শিল্পের প্রসার হয় তখন মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি পায়, এবং তখন তারা সেই মুনাফার কোন অংশ শ্রমিকদের দেবার কথা চিন্তা করে না, কিন্তু যখন সংকট সৃষ্টি হয় তখন মালিকেরা ক্ষতির বোঝা শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়।...

'এভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজের চরিত্র থেকেই যে ধর্মঘটগুলির উদ্ভব হয় সেই ধর্মঘটগুলিই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সূচনা করে। একজন নিঃস্ব একক শ্রমিকের পক্ষে ধনবান পুঁজিপতিদের মুখোমুখি হওয়ার অর্থই হচ্ছে শ্রমিকদের চূড়ান্ত দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া। পুঁজিপতিদের কাছে কোন সম্পদেরই কোন মূল্য থাকে না যদি তাদের উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সামগ্রীর উপর শ্রমিকরা তাদের শ্রম প্রয়োগ করে নতুন সম্পদ সৃষ্টি না করে। পুঁজিপতিদের কাছে একজন একক শ্রমিক নিতান্ত ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এই ক্রীতদাসের কাজই হবে নিরবচ্ছিন্নভাবে অপরের মুনাফা বৃদ্ধি করে যাওয়া এবং তার বিনিময়ে সে পাবে মাত্র এক টুকরো রুটি এবং সারা জীবন ধরে তাকে থাকতে হবে অনুগত এবং ভাড়াটে ভৃত্য হিসেবে। কিন্তু যখন শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের দাবি পেশ করবে এবং পুঁজিপতিদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না একমাত্র তখনই তারা আর ক্রীতদাস থাকবে না—তারা মানুষ হিসেবে দাঁড়াতে পারবে এবং দাবি করতে পারবে যে তাদের শ্রমের ফল দিয়ে একদল পরগাছার ধনবৃদ্ধি করা চলবে না, যারা শ্রম করছে তাদেরও মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে দিতে হবে। ক্রীতদাসরা তখন নিজেরা প্রভু হওয়ার দাবি করতে পারবে এবং আরও দাবি করবে যে জমিদার এবং পুঁজিপতিদের মর্জি অনুযায়ী তাদের জীবনের গতি নির্দ্ধারিত হবে না, তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ীই জীবনধারণ করবে। তাই ধর্মঘট সবসময়েই পুঁজিপতিদের মনে ভীতির সঞ্চার করে কারণ এর মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিদের আধিপত্য খর্ব হতে শুরু করে। শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে একজন জার্মান শ্রমিক গান বেঁধেছেন 'তোমরা বলিষ্ঠ বাহু যখন চাইবে, কারখানার চাকা বন্ধ হবে। এবং বাস্তবেও তাই। কলকারখানা, ভূস্বামীদের জমিজমা, যন্ত্রপাতি, রেলওয়ে ইত্যাতি সমস্ত কিছু একটা দানবীয় যন্ত্রের চাকাস্বরূপ এবং এই দানবীয় যন্ত্র বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন করছে এবং তা যথাযোগ্য স্থানে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই যন্ত্রটিতে গতিবেগ সঞ্চার করে শ্রমিক—যে শ্রমিক জমিতে লাঙ্গল দেয়, খনি থেকে সম্পদ উদ্ধার করে, কারখানার বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে, ঘরবাড়ি, রেলওয়ার্কশপ নির্মাণ করে। যখন শ্রমিক কাজ বন্ধ করে দেয় তখন ঐ সমগ্র যন্ত্রটিও স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রত্যেকটা ধর্মঘটই পুঁজিপতিদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রকৃত ক্ষমতাবান তারা নয়— প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী শ্রমিকরাই এবং ঐ শ্রমিকরা ক্রমাগত তাদের অধিকারকে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করে চলেছে। প্রত্যেকটা ধর্মঘটই শ্রমিকদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের অবস্থা হতাশাজনক নয় এবং তারা একক নন। ......ধর্মঘট কি অপূর্ব নৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করে যখন শ্রমিকরা দেখে যে তাদের সহকর্মীরা ক্রীতদাসের জীবন স্বীকার করে নিচ্ছে না এবং অন্ততঃ সাময়িকভাবে হলেও তারা পুঁজিপতিশ্রেণীর সমকক্ষ হিসেবেই দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। প্রত্যেকটা ধর্মঘটই সমাজতন্ত্রের প্রশ্নটিকে এবং পুঁজির শোষণ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নটিকে শ্রমিকদের মনে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটা প্রায়ই দেখা যায় যে কোন বড় কারখানায় বা কোন শিল্পের কোন শাখায় অথবা কোন শহরের ধর্মঘট সংঘটিত হওয়ার পূর্বে শ্রমিকরা কদাচিৎ সমাজতন্ত্রের কথা চিন্তা করে। কিন্তু ধর্মঘটের পরে শ্রমিকদের মধ্যে পাঠচক্র, সংগঠন ইত্যাদি গঠিত হতে থাকে এবং শ্রমিকরা ক্রমে অধিক সংখ্যায় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে দাঁড়ায়।'[১২]

কার্ল মার্কস ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত বিপ্লবী নীতিসমূহ সঠিকভাবে উপস্থাপন করেন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা তিনি ব্যাখ্যা করেন, অর্থনৈতিক ও

রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারণ করেন এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের উপর রাজনৈতিক সংগ্রামকে অগ্রাধিকার দেন। মার্কস ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের সুযোগ ও পরিধি ব্যাখ্যা করে বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রামের নীতির উপর ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ করেন। শ্রমিকশ্রেণীর চরম লক্ষ্যের সঙ্গে আশু দাবিদাওয়ার সংযোগসাধন করে তিনি এই কৌশলের সার্থক রূপদান করেন। মার্কস দেখিয়েছিলেন, যে ট্রেড ইউনিয়ন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না, তা পরিণামে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। সেই জন্যই মার্কস ও লেনিন যখন ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে 'স্কুল অফ কমিউনিজম' সংজ্ঞায় ভূষিত করেছেন তখন তাঁরা ঢালাওভাবে সর্বদেশের সর্বকালের ট্রেড ইউনিয়নকেই এ আখ্যা প্রদান করেননি। তারা কেবলমাত্র সেই ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেই 'স্কুল অফ কমিউনিজম' বলেছেন যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি পুঁজিপতি এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।

মার্কস ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু পরবর্তীকালে লেনিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ট্রেড ইউনিয়নের কি ভূমিকা হবে তা বিশ্লেষণ করছেন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেমন ট্রেড ইউনিয়নগুলি ধর্মঘট, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও অন্যান্য কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করবে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা হবে সমাজতন্ত্র গঠনের সক্রিয় কার্যকলাপে অংশগ্রহণ। জাতীয় অর্থনীতির পরিচালনায় অংশগ্রহণ, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা, শক্ত ব্রিগ্রেড গঠন, লেবার ডিসিপ্লিন, জনগণের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যকলাপে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে।

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন নির্ধারিত ট্রেড ইউনিয়নের এই সঠিক ভূমিকা, এবং তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞা 'স্কুল অফ কমিউনিজম'-এ যে মূল ধারণাগুলি সন্নিবিষ্ট রয়েছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে চারটি মৌল সূত্রের মধ্যে নিবদ্ধ করে বলা যায় '(১) ট্রেড ইউনিয়নগুলি হবে এমন সংগঠন যা সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করবে, (২) ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণায় রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করবে, (৩) ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমগ্র শ্রেণীর যোগাযোগ সাধন করবে, (৪) সর্বহারার বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়নগুলি পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে'।[১৪]

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিকাশ মার্কস, এঙ্গেলস্ ও লেনিন নির্ধারিত বিপ্লবী নীতি ও সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য। ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তার ইউনিয়নগুলির মধ্য দিয়ে মার্কস, এঙ্গেলস্ ও লেনিনের শিক্ষাকে যতখানি বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামও ততখানিই অগ্রগতি লাভ করবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর যে উদ্ভব শুরু হয়েছিল এবং ক্রমান্বয়ে বিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আজ যে শ্রেণী একটা পরিপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে তার ইতিবৃত্ত মার্কস, এঙ্গেলস্ ও লেনিনের এই চিরায়ত শিক্ষার আলোকেই বিবেচ্য।

১। Wiliam Z. Foster, History of the Three Internationals, p 6.
২। Ibid.
৩। V. I. Lenin, Selected works in two Volumes, Vol II, Part 2, Eng. Moscow 1951, p 202.
৪। William Z. Foster, History of the Three International, Book one, P. 42.
৫। Resolution of the Geneva Congress of First International. Working Men's Association (1866). Quoted by A Lozovosky in Marx and the Trade Unions, p. 14.
৬। Ibid. p. 15.
৭। Marx's letter to Bolte Marx-Engles Selected work, Vol II, pp. 423-424.
৮। Lenin The Trade Unions, The present situation and Trotsky's mistakes on Trade unions—A collection of articles and speeches P. 375.
৯। Marx, Communist Manifesto, Selected works vol. I. p. 14.
১০। Engles, Condition of the Working class in England, p. 261.
১১। Ibid.
১২। Lenin, On Strikes on Trade unions, pp 60-63.
১৩। A. Lozovsky, Marx and the Trade Unions, Radical Book club, P. 163.

বানান ও প্রবন্ধে উল্লিখিত তারিখগুলি অপরিবর্তিত

সুকোমল সেন রচিত *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড) (১৯৭৫) থেকে এই অংশটি পুনর্মুদ্রিত হল। প্রকাশক : নবজাতক প্রকাশনী।

UTTORA

Good Living Got Better

Our New Project

At

Bagdogra, Darjeeling District

Luxmi Portfolio Ltd.

Issue date 16 December 2019. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 7, Issue 24 Arek Rakam

mio
amore™

THE CAKE SHOP

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.